অয়ন

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ

অরঙ্গাবাদ □ মুর্শিদাবাদ

স্থাপিত : ১৯৬৭

।। দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ ।।

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ

২০১৬ - ২০১৭

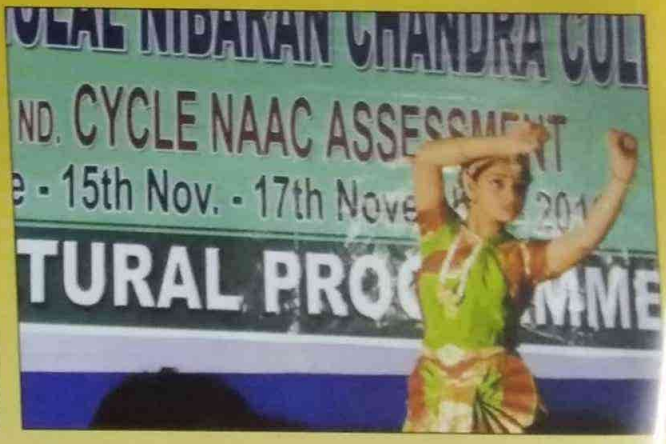

একদিনের আলোচনা সভা

NIBARAN CHANDRA
CYCLE NAAC
15th Nov. - 17th

অয়ন

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ

অরঙ্গাবাদ □ মুর্শিদাবাদ

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

২০১৬ - ২০১৭

সম্পাদনা

অধ্যাপক সাধন কুমার দাস

পত্রিকা উপসমিতির সহযোগী সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার দে

অধ্যাপক মহ: সাবলুল হক

শ্রী ধ্রুবকুমার বারিক

প্রাক্ কথন

সাড়ে তিন বছরের কার্যকালের মধ্যে আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি কলেজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। বড় কোনো অঘটন বা আলোড়ন— এই প্রতিষ্ঠানের শান্তি বিঘ্নিত করেনি।

হয়তো প্রত্যাশিত উন্নতির প্রসঙ্গ উঠলে কিছু প্রশ্ন থেকেই যাবে, তবু বলবো নতুন কয়েকটি বিষয়ে অনার্স পড়ানোর অনুমোদন আমরা পেয়েছি এই সময়েই। যেমন— ভূগোল, সংস্কৃত, প্রাণীবিদ্যা। তাছাড়া আরবী বিষয়ে জেনারেল কোর্সও আমরা খুলতে পেরেছি দু'বছর আগে থেকেই। আরো যেটি আনন্দের কথা, তা হল আমরা চলতি শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় চক্রের NAAC মূল্যায়ণ করতে পেরেছি এবং আমাদের কলেজ 'বি' গ্রেড লাভ করেছে।

কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার কমছে—এটা সত্যই উদ্বেগের কথা। কীভাবে আরো বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে কলেজমুখী করা যায়, এই বিষয়ে সকলের চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে। অভিভাবকগণও এই বিষয়ে সচেতন হবেন বলে আশা করি।

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের কলেজ পত্রিকা প্রকাশে এবারেও কিছুটা বিলম্ব হলো নানান কারণে। সকলকে আমরা শুভেচ্ছা জানাই।

ড. শ্যামল কুমার মণ্ডল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
ডি. এন. কলেজ
আওরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদকীয়

পায়ে পায়ে পঞ্চাশ।

পায়ে পায়ে অনেকখানি পথ পেরিয়ে আসা।

অর্ধশতাব্দী। সে বড় কম সময় নয়। বিশেষ করে মফস্বলের বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত একটি অঞ্চলে। একদিন বিড়ির গোডাউনই যে প্রতিষ্ঠানের আঁতুড়ঘর ছিলো, আজ তার নিজস্ব ভবন বিকশিত হয়েছে নানান শাখা প্রশাখায়।

সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষে প্রত্যাশিত প্রগতি হয়তো হয়নি, দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী অধ্যক্ষের অভাব তার একটা বড় কারণ। কলেজ সার্ভিস কমিশন গঠিত হওয়ার পর অধ্যাপকদের একটা বড় অংশ কলকাতা তথা দক্ষিণমুখী হওয়ায় শূন্যপদের আধিক্য, স্থিতাবস্থার অভাবে সকলেরই একটা 'গয়ংগচ্ছ' মনোভাব থেকে যাওয়ার কারণে মধ্যবয়সে প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছিল, একথা ঠিক। কিন্তু তারপর নতুন প্রযুক্তির স্রোত বেয়ে আসা একঝাঁক তরুণ অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মী এই কলেজকে সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে সাহায্য করেছে অনেকখানি।

আজ সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষে মফস্বল পঞ্চায়েত এলাকার একটি কলেজে কলা-বিজ্ঞান, ও বাণিজ্য — তিনটি শাখা মিলিয়ে মোট দশটি বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয়। শহরের কলেজের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো রেজাল্টও হয়। নতুন লাইব্রেরি ভবন, জিমখানা, কম্পিউটার সেন্টার, এন এস এস ইউনিট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র — এ সবই আজ কলেজের গর্ব। এই কলেজে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে আন্তঃকলেজ ফুটবল ও অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা। সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক জগতের বহু পদাধিকারী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এই কলেজে পদার্পণ করেছেন।

এ তো বাহ্য। আসল কথাটি হল, এই প্রতিষ্ঠানের আলোতেই এলাকার অধিকাংশ পরিবারের প্রথম প্রজন্ম স্নাতক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। আজও এই কলেজ প্রতি বছর লালন করে চলেছে বহু পিছিয়ে থাকা পরিবারের 'ফার্স্ট লার্নার'-কে। প্রতিষ্ঠান যেমন ঋণী এলাকার কাছে, এই এলাকাও তেমনি ঋণী প্রতিষ্ঠানের কাছে। এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের শর্তহীন শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যটুকুই সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষে হয়ে উঠুক প্রতিষ্ঠানের দুর্মূল্য জয়মাল্য।

২০১৬

আমরা শোকসন্তপ্ত

মুফতি মহম্মদ সইদ (কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী)
এ বি বর্ধন (রাজনীতিবিদ)
মৃণালীনি সরাভাই (প্রবীণ নৃত্যশিল্পী)
সুশীল কৈরালা (নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)
শচীন দাস (লেখক)
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (চলচ্চিত্র পরিচালক)
রফিক আজাদ (বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি)
অশোক ঘোষ (রাজনীতিবিদ)
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গণ-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা)
কান্তি বিশ্বাস (রাজ্যের প্রাক্তন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী)
অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী (সঙ্গীতকার)
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজনীতিবিদ)
মহম্মদ আলী (কিংবদন্তী বক্সার)
বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ (কুস্তিগীর)

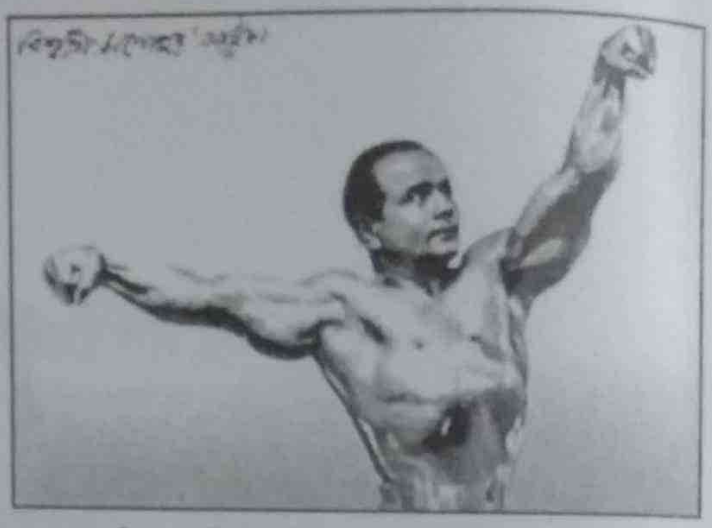

কে জি সুব্রহ্মানিয়ম (শিল্পী)
মহাশ্বেতা দেবী (জ্ঞানপীঠজয়ী লেখিকা)
সুহাস রায় (শিল্পী)
শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বাধীনতা সংগ্রামী)

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তির পর শঙ্খ ঘোষ ও রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়

আমরা গর্বিত

সাইনা নেহাল ও সানিয়া মির্জা পদ্মভূষণ।
দেবরাজ দত্ত ও সুনীতা হাজরার এভারেস্ট জয়।
সেরা বাংলা চলচ্চিত্র 'শঙ্খচিল'।
নিউটাউন স্মার্ট সিটি ঘোষণা।
এশীয় জুনিয়ার ২ সোনা লিলি দাসের।
অলিম্পিকে সাক্ষী, সিন্ধু, দীপার পদকজয়।
লতা মঙ্গেশকর বঙ্গবিভূষণ
শঙ্খ ঘোষকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

আমরা সহমর্মী

ভেঙে পড়ল বিবেকানন্দ উড়ালপুল, নিহত ২৩।
জাপানে প্রবল ভূমিকম্প, মৃত ৯।
ইকুয়েডার ভূমিকম্প, নিহত ৮০।
তুরস্কের বিদ্রোহ, নিহত ২৫০।
ইতালিতে ভূমিকম্প, ধূলিস্যাৎ ইতিহাস।
পাটনা-ইন্দোর এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা, মৃত ১২০।

ভেঙে পড়ল বিবেকানন্দ উড়ালপুল

পত্রিকা সম্পাদকের কলম থেকে

কথাটি খুব ব্যবহৃত—'বিজ্ঞান আমাদের বেগ দিয়েছে, কিন্তু আবেগ কেড়ে নিয়েছে।' আসলে দূরত্বের বাধা যখন থাকে, আর থাকে দুর্জ্ঞেয়তার রহস্যময়তা, তখনই মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় জানার ও বোঝার আকুলতা। সেখান থেকেই আবেগের বুদ্‌বুদ ফেনায়িত হয়ে ওঠে। আজ বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বিপ্লব আমাদের সামনে অজানা রহস্যের সমস্ত বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছে। একটা বোতাম টিপতেই আমরা হাতের তালুতে পেয়ে যাচ্ছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত খবর। খুব দ্রুত পৃথিবীটা আমাদের কাছে ছোট হয়ে গেছে, আকাশটা নেমে এসেছে মাটির কাছাকাছি। তাই এই নবপ্রজন্মের কাছে আবেগের কোনো মূল্য নেই। নিরেট নিখাদ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বকে দেখতে শিখেছে তারা।

কিন্তু এই বিশ্বসংসার তো হাতে গোণা কিছু মৌলিক পদার্থের সমষ্টিমাত্র নয়। যদিও মূলে রয়েছে কিছু অতিপরিচিত মৌল, তবু তারই সমাহারে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বর্ণময় কতো বিচিত্র রূপমাধুরী। আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে যদি আবেগ হারিয়ে যায়, তাহলে জগৎ ও জীবনের নান্দনিক দিক আমাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে যাবে। সাহিত্যের রসবোধের ধারণাও একটু একটু করে শুকিয়ে যাবে। সেই অশনি সংকেত লক্ষ্য করছি চলমান যুগ ও জীবনের মধ্যে।

তর্ক তুললে অবশ্যই বলা যায় যে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও গল্প লেখে, কবিতা লেখে, সাহিত্য পড়ে, পত্রিকা সম্পাদনা করে। কিন্তু কতকগুলো ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দিয়ে তো একটা সময় ও সমাজের সামগ্রিক প্রবণতাকে চিহ্নিত করা যায় না। দু'চারটে উদাহরণ বাদ দিলে বলতেই হয়, বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই বই পড়ে না, লাইব্রেরিতে যায় না। পড়ুয়া ছেলেরা যেটুকু যায়, তা পরীক্ষার নোটস্ সংগ্রহের জন্য। সেখানেও মৌলিক চিন্তাভাবনার অভাব। সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যচর্চার থেকে শতযোজন দূরে থাকে আজকের ছেলেমেয়েরা। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ আজ ধুলো জমে মলিন হচ্ছে প্রতিটি গ্রন্থাগারে।

আমাদের মতো মফস্বল এলাকায় এই অনুশীলন আরো কম। তার প্রধান কারণ, দারিদ্র ও অশিক্ষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের প্রসারের আলো শহর অতিক্রম ক'রে এতটা প্রত্যন্ত এলাকায় না পৌঁছানো। ফলে এলাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত সাহিত্যবোধ গড়ে উঠছে না।

বিজ্ঞান বা বাণিজ্য— শিক্ষার্থী যে-শাখারই হোক না কেন, প্রতিটি শিক্ষিত মানুষেরই একটি স্পষ্ট ও শৈল্পিক জীবনবোধ থাকা প্রয়োজন, তা না হলে সে যতই উচ্চশিক্ষিত হোক না কেন, সে পরিপূর্ণ মানুষ

হয়ে উঠবে না কোনোদিন। জড়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান—এই দুইয়ে মিলেই মানুষ পূর্ণতর জীবনের পথে এগিয়ে যায়। সাহিত্যচর্চাই পারে সেই আত্মজ্ঞানের উদ্বোধন ও প্রকাশ ঘটাতে।

মনে হচ্ছে, 'ধান ভানতে শিবের গীত' গেয়ে চলেছি হয়তো। কিন্তু আমি যা বলতে চাইছি, এ হল তারই উপক্রমণিকা। আমি একথাই বলতে চাইছি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যতখানি বাহ্যজ্ঞানের প্রসার ঘটায়, হয়তো আত্মিক জ্ঞানের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ততখানি সহায়ক হয় না, কিম্বা সামান্যই হয়। অথচ, আত্মিক জ্ঞানের উত্তরণ ছাড়া একজন যথার্থ মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। আমরা শিক্ষকেরা কেউ কেউ হয়তো পরোক্ষভাবে আমাদের বিস্তৃত মহাজীবন এবং তারই প্রেক্ষাপটে আমাদের জীবনবোধ নিয়ে ছাত্রদের মনে মাঝে মাঝে আলো ফেলার চেষ্টা করি, কিন্তু সে তো সামান্যই। আসলে মানুষের মধ্যে এই বোধ তৈরি হয় তার পরিপার্শ্ব ও পরিজন থেকে এবং নিবিড় গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে। আমাদের দুশ্চিন্তা, আমাদের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা এই আত্মিক সংকট কীভাবে কাটিয়ে উঠবে। সুন্দরের জন্য সনিষ্ঠ তপস্যা না করলে জীবন কীভাবে সুন্দর হয়ে উঠবে? জীবন ও পরিবেশ সুন্দর হয়ে না উঠলে সত্য ও সুন্দরের অনুশীলনই বা কীভাবে সম্ভব?

অনেক ছাত্রছাত্রীই চায় যে তার লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হোক, পাঁচজনে পড়ুক। আমাদের কলেজ পত্রিকার জন্য যে পরিমাণ লেখা পড়ে, তার আয়তন দেখেই একথা প্রমাণ করা যায়। অনেকে উৎসাহের আতিশয্যে তার লেখাটি যাতে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার জন্য ব্যক্তিগত সুপারিশও করে। কিন্তু হতাশ হতে হয় সেই লেখাগুলি যখন পত্রিকার জন্য বাছাই করতে বসি।

অথচ আমাদের চারপাশে গল্প ও কবিতার উপাদানের তো অভাব নেই। জীবন ক্রমশঃ যান্ত্রিকতায় জটিল হয়ে উঠছে, মানসপ্রবণতাও অনেক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর রহস্যময়তার দিকে চলে যাচ্ছে। জীবনের জলছবি এখন বহুবর্ণবিচিত্র। গল্পের উপাদান, কবিতার অনু-পরমাণু এখন প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশের হাওয়ার মতো উড়ে বেড়ায়। তাকে দেখার চোখ আর ধরার কৌশল আমরা শিখতে পারিনি বলে সাহিত্যচর্চা করতে বসে শুধু আবর্জনা দিয়ে পাতা ভরাই। কীভাবে এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে আজকের ছেলেমেয়েরা? যৌবনের স্থূল চাপল্য অতিক্রম করে একজন তরুণ বা যুবক আপন হৃদয়ের গভীরতম জায়গাটিকে স্পর্শ করতে পারে না কেন? কেন সে ভালো করে এখনো জানে না, সে নিজে কী চায় আর তার গন্তব্যই বা কোথায়? নিজের জীবনের স্বচ্ছ ছবি তার কাছে নেই বলে, গড় মানুষের জীবনচিত্র সে আঁকতে পারে না।

সুতরাং একজন শিক্ষার্থীর যথার্থ শিক্ষা গড়ে ওঠে আত্মবোধের মাধ্যমে। চারদিকে এত অপসংস্কৃতি, যান্ত্রিকতা, স্থূল যৌনবোধ নানান মাধ্যমে আমাদের চিন্তাকে কলুষিত করে চলেছে, যে স্বচ্ছ সুন্দর ভাবনার জগতের ঠিকানাটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ফলে আমাদের কলম দিয়ে উদ্‌গীর্ণ হয় আমাদের অখাদ্য-কুখাদ্যের বর্জ্য পদার্থ। এর জন্য নিরন্তর সাহিত্যপাঠ, স্বচ্ছ সংস্কৃতির চর্চা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, মাঠের রাখালটির জন্য ওস্তাদ তানসেন রাখালটির কাছে নেমে আসবেন না, রাখালটিকেই সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে তানসেনের কাছে উঠতে হবে।

সমাজব্যবস্থাকে আমরা রাতারাতি পাল্টে ফেলতে পারব না, কিন্তু আমরা একটু চেষ্টা করলেই পারি ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপে সময়ের অপচয় না করে ছাত্রজীবনের মূল্যবান সময়টুকু লাইব্রেরিতে গিয়ে সৎসাহিত্যের সঙ্গে কাটাতে। স্থূল বিনোদনের জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ঘটায়, কিন্তু শিল্প সাহিত্যের পরিশীলিত জগৎ আমাদের মনের মধ্যে এনে দেয় গভীর প্রশান্তি। এই প্রশান্তির জগৎ থেকেই সাহিত্যসৃষ্টি হয়। আমি ছাত্রছাত্রীদের বারবার একথা বলব যে তারা যেন প্রতিদিন নিয়মিত পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলে।

আমরা অয়নের পৃষ্ঠাপূরণ করতে গিয়ে প্রতিবছর এই প্রতিকূলতার মুখোমুখি হই। সম্পাদনা করতে গিয়ে বহু লেখার বেদনাদায়ক অঙ্গহানি করতে হয়। তবুও ঘাটতি থেকে যায় মানোত্তীর্ণ লেখার। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

তবু আনন্দের কথা, আমাদের ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে লেখা গল্প, কবিতা দিয়ে প্রতিবছর নিয়ম করে আমাদের কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়ে চলেছে। যাদের লেখা প্রকাশিত হল না, তারা ম্যাগাজিনের নোটিশের অপেক্ষায় থেকো না, সারাবছর ধরে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে এই চর্চা চালিয়ে যাও শিক্ষকদের দেখাও, তারপর নিজেকে প্রতিদিন 'আপডেট' করো। যাতে তোমার লেখা শুধু কলেজ ম্যাগাজিনে নয়, সর্বত্রই সাদরে নির্বাচিত হতে পারো।

তোমরা সকলে আমার স্নেহ ও ভালোবাসা নাও।

সাধন কুমার দাস
সম্পাদক

অধ্যক্ষ অধ্যাপকমণ্ডলী ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

অধ্যক্ষ

ড. শ্যামল কুমার মণ্ডল, এম. কম, এম ফিল, পি-এইচ.ডি (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

অধ্যাপকমণ্ডলী

- বাংলা বিভাগ
  - ১। সাধন কুমার দাস, এম.এ. (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। ড. সুনীল কুমার দে, এম.এ. পি-এইচ.ডি
  - ৩। ড. রাজন গঙ্গোপাধ্যায়, এম.এ. পি-এইচ.ডি
  - ৪। অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, এম.এ., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৫। একলাচ মণ্ডল, এম.এ., বি.এড, এম ফিল (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৬। মাসুদ রানা, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
- ইংরাজি বিভাগ
  - ১। ঈশান আলি, এম.এ., এম. ফিল. (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। রাজকুমার হালদার, এম. এ., এম. ফিল.
  - ৩। অন্তরা সাহা, এম.এ. (চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপিকা)
  - ৪। মহ:-আরিফ নাদিম, এম.এ., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৫। মাবুদুল ইসলাম, এম.এ., বি.এড (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৬। মহ: তোফিজুল ইসলাম, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৭। প্রতাপচন্দ্র মণ্ডল, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
- ইতিহাস বিভাগ
  - ১। মহ: সাবলুল হক, এম.এ., বি.এড (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। শৈলেশচন্দ্র রায় এম.এ., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৩। মহ: নাজমুল্লা, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৪। মসিউর রহমান, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
  - ৫। রফিকুল ইসলাম, এম.এ. এম.এড (অতিথি অধ্যাপক)
- দর্শন বিভাগ
  - ১। চন্দ্রশেখর মণ্ডল, এম.এ., বি.এড (বিভাগীয় প্রধান/বিদায়ী)
  - ২। পরিতোষ বর্মন, এম.এ.
  - ৩। সুমন্ত ঘোষবাগ এম.এ., বি.এড
  - ৪। সঞ্জয় পাল, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৫। নন্দিতা সরকার (মণ্ডল), এম.এ., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
  - ৬। লাল খান, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক/বিদায়ী)
  - ৭। সুধন দাস, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)
- সংস্কৃত বিভাগ
  - ১। জয়ন্ত মণ্ডল, এম.এ. (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। সুজয় কুমার পাল, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
  - ৩। মীনাক্ষী লাহা, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
- অর্থনীতি বিভাগ
  - ১। গোপাল চন্দ্র রায়, এম.এ.
  - ২। ড. সম্প্রীতি বিশ্বাস, এম.এ., এম. ফিল., পি-এইচ.ডি
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
  - ১। কৃষ্ণা রায়, এম.এ., এম ফিল (বিভাগীয় প্রধান)
  - ২। শিঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্তী, এম.এ.
  - ৩। পম্পা ব্যানার্জী, এম.এ., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
  - ৪। নসরৎ বেগম, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
  - ৫। সালাউদ্দিন সেখ, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)
  - ৬। মরিয়ম রেজা, এম.এ.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

- শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১। সনাতন সরকার, এম.এ. (আংশিক সময়/বিভাগীয় প্রধান)
২। অমর মণ্ডল, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
৩। দেবাশিস মণ্ডল, এম.এ., বি.এড (অতিথি অধ্যাপক)
৪। অমৃতা দাস, এম.এ., বি.এড (অতিথি অধ্যাপিকা)

- বাণিজ্য বিভাগ

১। সি.এ. নিখিলেন্দু বিকাশ দাস, এম.কম., এম ফিল, এল.এল.বি
২। ড. শ্যামলকুমার মণ্ডল, এম.কম., এম ফিল, পি-এইচ.ডি
৩। মাধব কুমার বিশ্বাস, এম.কম
৪। সুখেন মণ্ডল, এম.কম. (অতিথি অধ্যাপক)
৫। তোফাজ্জেল আহমেদ, এম.এ., এল.এল.বি., এল.এল.এম. (অতিথি অধ্যাপক)

- পরিবেশবিদ্যা বিভাগ

১। হাসনারা খাতুন, এম.এস.সি. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

- শরীরশিক্ষা বিভাগ

১। ছমায়ুন কবীর, এম.পি.ই (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
২। মনোরঞ্জন প্রামাণিক, এম.পি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

- রসায়ন বিভাগ

১। সুমিত সিংহ, এম.এস.সি. (অতিথি অধ্যাপক)
২। বাজিয়া সুলতানা, এম.এস.সি. (অতিথি অধ্যাপিকা)

- পদার্থবিদ্যা বিভাগ

১। ড. অমিতলাল ভট্টাচার্য, এম.এস-সি, পি-এইচ.ডি

- গণিত বিভাগ

১। প্রাণকৃষ্ণ দাস, এম.এস.সি., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)
২। বেগম সামসুন্নেহার, এম.এস.সি (অতিথি অধ্যাপিকা)

- উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

১। অনুপ কুমার সরকার, এম.এস.সি (বিভাগীয় প্রধান/বিদায়ী)
২। সুচন্দা চক্রবর্তী, এম.এস.সি (অতিথি অধ্যাপিকা)

- প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১। শম্পা বাগ, এম.এস.সি (বিভাগীয় প্রধান/বিদায়ী)
২। সৌমী ঘোষ চৌধুরী, এম.এস.সি (অতিথি অধ্যাপিকা)

- ভূগোল বিভাগ

১। শুভময় কুণ্ডু, এম.এ., বি.এড (আতথি অধ্যাপক বিভাগীয় প্রধান)
২। কৌশিক বারিক, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)

- আরবী বিভাগ

১। আবু সালেম (অতিথি অধ্যাপক)

- গ্রন্থাগার

১। মহ: নূরুল ইসলাম, এম.কম., এম.লিব (গ্রন্থাগারিক)
২। স্বাধীন রজক, বি.কম (সহায়ক)
৩। সুদীপ্ত দাস, বি.এ. (ক্যাজুয়াল কর্মী)
৪। দীপ বিশ্বাস, মাধ্যমিক (সহায়ক/ক্যাজুয়াল কর্মী)

- কার্যালয় বিভাগ

১। মহ: হারোজ আলি, বি.এ.অনার্স (প্রধান করণিক)
২। ধ্রুবকুমার বারিক, এইচ.এস. (অফিস সহায়ক)
৩। অশোক কুমার রায়, অষ্টম মান (অফিস সহায়ক)
৪। নন্দ কিশোর সিং, অষ্টম মান (প্রহরী)
৫। অধীন রজক, অষ্টম মান (প্রহরী)
৬। মইদুল ইসলাম, বি.এ. (ইলেকট্রিশিয়ান কাম কেয়ারটেকার)
৭। মজিবুর রহমান, বি.কম করণিক (ক্যাজুয়াল কর্মী)
৮। আনোয়ার হোসেন, বি.কম অনার্স, পিজিডি, বি.এম (ক্যাজুয়াল কর্মী)
৯। রমানাথ দেব (ক্যাজুয়াল কর্মী)
১০। সুজিত জমাদার, অষ্টম মান, সাফাই কর্মী (ক্যাজুয়াল কর্মী)
১১। খালেক হোসেন, এস এফ (ক্যাজুয়াল কর্মী)
১২। সীতা সিংহ, মাধ্যমিক লেডি আঃ (ক্যাজুয়াল কর্মী)

- ছাত্রাবাস

১। অনুপ কুমার সিংহ সহকারী পাচক
২। প্রশান্ত সে, সহকারী পাচক
৩। মহ: মন্টু সেখ, সহকারী পাচক

- জিমখানা

১। গৌতম পাল, এইচ.এস, প্রশিক্ষক (ক্যাজুয়াল কর্মী)

D.N. College Computer Centre

(Affiliated by : W.B. State Council of Technical Education, Govt of India)

Sponsored by

G.D. Charitable Society
Aurangabad, Murshidabad

1. Supriya Sengupta (Facalty-in-charge)
2. Somnath Guha
3. Raju Barman

ডি.এন. কলেজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ডা: রাজেশ খান্না, ডি. এইচ এম এস (ক্যাল)

সূচীপত্র

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে ডি. এন. কলেজ	অধ্যাপক নিখিলেন্দু বিকাশ দাস	১১
ফিরে দেখা	প্রাক্তন অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন পাণ্ডে	১৪
তিনটি রম্যরচনা	অধ্যাপক সাধন কুমার দাস	১৬
নারী শিক্ষার ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গ	অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার দে	১৮
প্রসঙ্গ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'	অধ্যাপক মাসুদ রানা	২৩
দুটি মন	বিপাশা গোস্বামী	২৭
বাংলা—আমার বাংলা	পাভেল আখতার	২৯
স্মৃতিবিজড়িত ডি.এন. কলেজ	আনোয়ার হোসেন সিদ্দিকী	৩০
ডি. এন. সি. কলেজ সংগঠকদের প্রণাম	মহ: মোজাম্মেল হক	৩২
সুস্থ সমাজ গঠনে ছাত্র ও যুব সমাজের ভূমিকা	বানী ইসরাইল	৩৪
প্রেম : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা	ইসমোতারা বেগম	৩৬
সমাজ ব্যবস্থার সেকাল ও একাল	মধুমিতা পাল	৩৭
শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজ	বরুণ দাস	৩৮
বিদায় বেলা	বর্ণালী চৌধুরী	৪৮
নারীর অধিকার	মণীষা দাস	৪৮

কবিতা

দুটি কবিতা — ঘুড়ি, আয়নার মুখ	অধ্যাপক ড. রাজন গঙ্গোপাধ্যায়	৩৯
ব্যথা এসেছিল	কেয়া দাস	৩৯
বৃক্ষের ছেদন	মাম্পী দাস	৩৯
শিক্ষক দিবস	অনিন্দিতা দাস	৪০
ভেদাভেদ	সনেল হাঁসদা	৪০
কোথায় তুমি	শ্বেতা কর্মকার	৪০
লুকানো ভালোবাসা	অনিতা দাস	৪০
মা	রাজু দাস	৪১
স্বার্থপরতা	সীমা দাস	৪১
ইতিহাস	অয়ন দাস	৪১
চরিত্র	করবী সরকার	৪১
ভূমিকম্প	সুপ্রিয় ঘোষ	৪২
আমার দেশ	রাজু দাস	৪২
মিনি	কেয়া দাস	৪২
ভালো লাগে	মানজুলা খাতুন	৪২
আমি কি ভালোবাসি	আবিদা সুলতানা	৪৩
হৃদয়ের আয়না	আবু সুফিয়া	৪৩
জাতের দ্বন্দ্ব	নারায়ণ বিশ্বাস	৪৩
বৃষ্টি	মুনিয়ারা খাতুন	৪৩
হতাম যদি	দেবরাজ দাস	৪৪
কে তুমি	ওয়াসিম আকরাম	৪৪
স্বাধীনতার এতকাল পরেও নারী	প্রিয়াঙ্কা দাস	৪৫
অকাল মরণ	মাম্পী দাস	৪৫
ভারত	সামিউল আলম	৪৫
প্রকৃতির করুণ পরিণতি	অনামিকা দাস	৪৬
আজ শিক্ষার কী পরিণতি	আয়েষা খাতুন	৪৭

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে ডি. এন. কলেজ

অধ্যাপক নিখিলেন্দু বিকাশ দাস

দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ। এ বছর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের সূচনা। এই লম্বা সফরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই প্রতিষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ জন্মবৃত্তান্ত উদ্ধার করা দুরূহ কাজ। কেননা, আমরা যাঁরা বর্তমানে কর্মরত প্রবীন অধ্যাপক বা শিক্ষাকর্মী, এই প্রতিষ্ঠানের সূচনাকালে আমরা ছিলাম নিতান্তই শিশু। অবসরপ্রাপ্ত হাতেগোনা যে ক'জন ব্যক্তি এখনো জীবিত, যাঁরা প্রথমদিন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের ধূসর স্মৃতির উপর নির্ভর করে এবং সেই সময়ের হলুদ হয়ে যাওয়া কিছু জীর্ণ নথির উপর ভিত্তি করে কলেজের ইতিকথার একটি রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করা যায়।

আসলে যে কোনো ইতিহাসের গায়ে সময়ের পলি পড়ে। কিছু মিথ, কিছু কিংবদন্তি যুক্ত হয়ে প্রকৃত তথ্যকে কিছুটা আবৃত করে। এতদঞ্চলে তথা জঙ্গিপুর মহকুমার আনাচে কানাচে লোকমুখে শোনা যায়, এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ভাবনার কুঁড়ি ফোটে শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবীদের এক সান্ধ্য আড্ডায়, যা প্রস্ফুটিত হয় তদানিন্তন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিধায়ক হাজি লুৎফল হক ও এম. বি. এম. কোম্পানির কর্ণধার রাজাবাবু তথা শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার দাস মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে।

কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের গবেষক ছাত্রের মতো আমি মাঝে মাঝেই হাতড়ে বেড়িয়েছি বহু পুরনো নথিপত্র। পঞ্চাশ বছরে বহু নথিপত্রই স্থানবদল করেছে— এ ঘর থেকে ও ঘর, এ আলমারি থেকে সে-আলমারি। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় যখন কলেজের একতলার মেঝেতে হাঁটু বরাবর জল, তখন কিছু খাতাপত্র আগোছালো হয়েছে। তারমধ্যে যেটুকু সংরক্ষিত রয়েছে, তা থেকে জানা যায় কলেজ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠিতে (No. C/74/ Affiliation CU. dt. 17/07/1966) IC / Registrar জানালেন যে কলেজের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে (Dt. 5.7.1966) ১৯৬৬-৬৭ সেশনের জন্য অনেক দেরিতে প্রস্তুতি নেওয়ার কারণে ও গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্য যে ২৫০০০ টাকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল, তা অপ্রতুল বিবেচনায় এবং জেনারেল ফান্ডে ৫০,০০০, Res. fund-এ ১০,০০০, Salary deficit fund-এ ২৫,০০০ প্রভৃতিতে মোট ১,৩০,০০০ টাকার সংস্থান করে পরবর্তি সেশনে আবেদন করার জন্য বলা হয়েছিল। এর আগে ৮/৪/১৯৬৬ তারিখের একটি সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে অরঙ্গাবাদ হাইস্কুলে ক্লাস শুরুর প্রস্তাবনা WBBSE-এর অনুমতি না পাওয়ায় সকলের আবেদনে M/s. P. Sen & Co-র বদান্যতায় কোম্পানির Senco's Godown-এ ক্লাশ শুরু করার প্রস্তাবনায় D. Sen ও অন্যান্য ভ্রাতার অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যবস্থা হয়। ১৬/৬/১৯৬৭ তারিখের M/S. P. Sen & Co. লিখিত অঙ্গীকারপত্র, যা ডি. বি. সেন ও ডি. সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বাক্ষরের দ্বারা নিশ্চিত হয়।

এর আগে ডি. এন. কলেজ কমিটির চিঠির উত্তরে ৬/৪/৬৭ তারিখে (চিঠি নং C/1528/Affel) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

১৪/৭/১৯৬৬ তারিখের চিঠি অনুযায়ী (নং C/74/Affi.cu) শর্তসমূহ পূরণ অর্থাৎ ন্যূনতম তহবিলের ব্যবস্থা করে আবেদন করার পরামর্শ দেন।

২০/৪/১৯৬৭ তারিখে ডি. এন. কলেজের সেক্রেটারি শ্রী দিলীপ কুমার দাস অর্থাৎ রাজাবাবুর অঙ্গীকারপত্র যার দ্বারা জেনারেল ফান্ডে ৭৬,০০০ টাকা ও বিল্ডিং ফান্ডে ২৫,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ৭/৬/৬৭ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (C/1904/1906/Affi) তৎকালীন কলেজ পরিদর্শক Dr. N.K. Bhattacharya-কে প্রস্তাবিত কলেজ পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন।

এই সংবাদ পেয়ে ২২/৬/৬৭ তারিখে শ্রীযুক্ত বিজন কান্তি বিশ্বাস মহাশয়কে (যিনি গত ২০১৬-র জুন মাসে পরলোক গত) অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করে ও কলেজের নিজস্ব গৃহনির্মাণের অঙ্গীকারের কাগজপত্র জমা দেওয়া হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ২৮/৬/৬৭ তারিখে কলেজ পরিদর্শন হয়।

সেই পরিদর্শনের রিপোর্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তার ৮/৭/৬৭ তারিখের বৈঠকে অনুমোদন করে (চিঠি নং C/159/Affi dt. 25.7.67)। এর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক বহু সাধনার বহু প্রতীক্ষার, বহু ঐকান্তিক চেষ্টার, বহু বহু আরো কত কিছু উপাসনার সফল সমাপ্তি ঘটালেন। উচ্চশিক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠী, গরীব অভিভাবকের (যারা অধিকাংশই অশিক্ষিত) পুত্র কন্যার (যারা পড়াশোনার মধ্যেও বাল্য শ্রমিক হিসেবে অনেকেই বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত) উচ্চশিক্ষার দ্বার খোলার বন্দোবস্ত এবং অনুমোদন পেল।

এরপর ৪/৮/৬৭ তারিখে PU, Arts B.A Pass Course নিয়ে ১৯৬৭-৬৮ সেশনে Senco's Godown-এ ২৩/৮/৬৭ তারিখের শুভ লগ্নে কলেজের নিয়মমাফিক কাজ শুরু হল। ২০/৯/৬৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে Eng, Beng, Hist, Eco, Civics, Logic, Com. Geography, Com. Arith matic ও Book Keeping বিষয়ের PU এবং Eng, Beng, Hist, Pol.Science, Economics, Philosophy, B.A. Pass -এর বিষয় হিসেবে যথাক্রমে PU Exam ১৯৬৮-তে, B. A. Part -I ১৯৬৯-এ B. A., Part - II ১৯৭০ সালে কলেজের প্রথম পরীক্ষা নেওয়ার অধিকারের অনুমোদন পাওয়া গেল।

২৮/৬/৬৭ তারিখে পরিদর্শক দলের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী Provisional G.B. হিসেবে যে সকল ব্যক্তি ও পদাধিকারীর নাম নথিভুক্ত আছে, তা হল :

1. H.P. Bagchi, (S.D.O., Jangipur), 2. Radhanath Choudhury, 3. Lutfal Hoque (M.P.), 4. Dilip Kumar Das, 5. Anil Kumar Das, 6. Sarojakshya Bhattacharya, 7. Benoyendranath Das, 8. Saral Kumar Guha, 9. Tazamul Hoque, 10. B.K. Biswas (Principal), 11. T. R. (Two)—(a) Prof. Shyamsundar Bhattacharya 16.11.67, (b) Prof. Jati kumar Roy 16.11.67.

এখানে উল্লেখ্য যে Godown-এ Class করার জন্য শুধুমাত্র ১৯৬৭-৬৮ সেশনেই অনুমোদন ছিল এবং যথাযথ নিজস্ব গৃহ ইতিমধ্যে তৈরি না হলে ১৯৬৮-৬৯ সেশনে ভর্তি নেওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞাও ছিল।

যাইহোক, কলেজের বর্তমান বিল্ডিং সম্পূর্ণ হয়ে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে স্থানান্তরিত হয়। প্রখ্যাত ব্যক্তি তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন চ্যান্সেলার ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক ১১/১১/১৯৬৮ তারিখে বর্তমান ভবনের উদ্বোধন হয়। সেই সময়ের ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত গোডাউন ছাত্রদের হোস্টেল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য রাখা হল।

২/৮/৬৭ তারিখের G. B. মিটিং-এ (সম্ভবত: প্রথম) যে সকল কর্মচারী কলেজে যোগদান করেন, তাঁরা হলেন—

1. Sri Dibakar Pal	H.C Cum Accountant 1.7.67
2. Sri Rakhahari Mukherjee	Cashier Cum Clerk 1.7.67
3. Sri Santosh Kr. Sarkar	Asst. Librarian 16.08.67
4. Sri Narendranath Barik	Principal's Bearer 19.7.67
5. Nazrul Islam	Bearer 16.8.67

৩১/৮/৬৭ তারিখের মিটিং-এ অনুমোদন পেলেন—

1. Prof. Sudharanjan Sengupta -	English 16.8.67
2. Prof. Biswanath Roy -	Bengali 16.8.67
3. Prof. Dhirendranath Biswas -	History 16.8.67
4. Prof. Shyamsundar Bhattacharya -	Pol. Sc 16.8.67
5. Prof. Jagabandhu Mandal -	Commerce 16.8.67
6. Prof. Shanti Ranjan Pandey -	Philosophy 23.8.67
7. Prof. Jati Kr. Roy -	Economics 29.8.67

৩১.৮.৬৭ তারিখের G. B. Meeting-এ যে বিল্ডিং কমিটি তৈরি হয়, তার তালিকা :

১। শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস, ২। শ্রী কানাইলাল শেঠি, ৩। মুন্সি ইদ্রিশ আহমেদ, ৪। শ্রী দিলীপ কুমার দাস, সেক্রেটারি, ৫। শ্রী বিজনকান্তি বিশ্বাস, প্রিন্সিপাল।

Founder Member হিসেবে যাদের নাম উল্লিখিত রয়েছে, তাঁরা হলেন ঃ

১. শ্রী অজিত কুমার মুখার্জী, ২. হাজি নূরুজ্জমান হক, ৩. শ্রী মৃত্যুঞ্জয় বক্সীপাল, ৪. শ্রী বিজয় কুমার চৌধুরী, ৫. শ্রী অনিল কুমার সান্যাল, ৬. শ্রী জীতেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, ৭. শ্রী হৃদয়গোপাল সরকার, ৮. শ্রী মৃণাল সেনগুপ্ত সরকার, ৯. শ্রী মহেন্দ্রনাথ সাহু, ১০. শ্রী হরিদেব দাস, ১১. শ্রী কমলাকান্ত শেঠী, ১২. শ্রী লক্ষ্মীপতি চৌধুরী, ১৩. শ্রী বিজয় কুমার সরকার, ১৪. মহঃ হাবিবুল হক, ১৫. শ্রী দেবীরঞ্জন মুখার্জী, ১৬. শ্রী নিত্যানন্দ শেঠী, ১৭. শ্রীমতী মায়া দাস, ১৮. শ্রী অশনি কুমার দাস, ১৯. শ্রী অজিত কুমার দাস, ২০. শ্রী মিহির কুমার দাস, ২১. শ্রী সমরেশ কুমার চৌধুরী, ২২. মহঃ জেয়াদউদ্দিন, ২৩. শ্রী সজল কুমার দত্ত।

যাঁরা এককালীন কমপক্ষে ১০,০০০ টাকা কলেজ ফান্ডে দান করেছেন, তাঁদের নাম দাতা-মেম্বার হিসেবে উল্লিখিত রয়েছে।

১. শ্রী অশিনী কুমার দাস, ২. শ্রী অজিত কুমার দাস, ৩. শ্রী মিহির কুমার দাস, ৪. শ্রী নিত্যকুমার দাস (এডভোকেট), ৫. শ্রী অমিয়কুমার দাস (এডভোকেট), ৬. মেসার্স অবনাশ শাহাজাদী স্টোর্স এবং মাহাবুব তুজবেটী, ৭. মেসার্স মদনপতি মেডিক্যাল স্টোর্স ও কোং, তুজবেটী, ৮. মেসার্স শেখ ফরিদ ও কোং, চন্দ্রপুর, ৯. ফরিদপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন।

আমি কলেজে যোগদান করি ১৯৮৬ সালের ধরা সেপ্টেম্বর। কিছুদিন পরে জেনেছি, এই শিক্ষকের পদটি বাণিজ্য বিভাগের প্রথম পদ যা সকলের প্রিয় অধ্যাপক অমলেন্দু মজুমদার (যিনি ১৯৮৬ সালের জুন মাসে অকালে প্রয়াত) ছেড়ে যাওয়া আসন। তাঁর বয়স ও শখা ছিল তখনকার মাত্র ২৫ বছরের বয়সের এই অনভিজ্ঞ অধ্যাপকের। যাইহোক, প্রথম দিকে অসুবিধা হলেও, জেদের সাথে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করেছি এবং প্রায় ৩১ বছরের শিক্ষকতায় অনেক ছাত্রছাত্রী পেয়েছি যারা এখন ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে নজরুল, বিকাশ, দেবাশীষ, অনুপ, দীপক, সাহাবুদ্দিন, কাজল, সুজিত, বাদেন্দু, আনওয়ারুল, শরাফত্ প্রমুখ আরো অনেকে, এক্ষণে নাম মনে পড়ছে না।

আমি কলেজে যোগদান করার পর চার মাস থেকে এক বছরের মধ্যে আরও চার জন অধ্যাপক, রাধাপতি পাল, সনৎ দাস, তপন কুমার কর্মকার ও নির্মলেন্দু পাল যথাক্রমে বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। তারা আমার মতো অমানুষ নয়। কুল শিক্ষকের পদ ছেড়ে কলেজে এসেছিল। সেসময় ১৯৯০ সালের ১৭ মার্চ গোবরডাঙ্গা কলেজে ট্রান্সফার নিয়েছে। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। সেটা উল্লেখনীয় যে চার জন আমরা একসাথে যে যার মতো থাকলেও, কিছুদিন পরে আর্থিক বন্ধু বান্ধব পাত্রী আমরা ব্যবহারিক মেস করে থাকতে লাগলাম। সেই সময় আমরা সকলেই অবিবাহিত। অনেক স্মৃতি সেই সকল দিনগুলিকে জড়িয়ে আছে। এখানে মেসের বিষয়ে লেখার ইচ্ছা থাকলেও কাগজের বৃদ্ধি অবাঞ্ছিত বিবেচনায় শুধু কয়েকটি বিষয় না বলে থাকতে পারলাম না। অনেক সময় শিক্ষক এমনকি অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের 'লঙ্কা পাড়া' বলতেন। এইভাবে প্রায় ৫ বছর অতিবাহিত করে একে একে বিবাহিত হয়ে গেলে একসাথে থাকাটি পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর বিভিন্ন জায়গায় বাসা হলেও আমাদের আড্ডা হতো সেই শেখরদা, বিদ্যাপতি দা, সুনীল সেনগুপ্ত দা, বিশ্বের দা, গুণি দা, প্রদ্যুৎ সাহা কোনো একজনের বাসায়। তার সাথে ছিল, প্রথম দিকের বাজের অধ্যাপক ও ইনচার্জ, হিতেনবাবু, শান্তিদা, অজিত দা, তপন দা, সত্যের ভট্টাচার্য দা, প্রদ্যুৎ বাবুর মাঝে মাঝে। সেই সকল স্মৃতি আজ দুর্লভ। বর্তমানে আমি একজন প্রবীণ, মাননীয় ও নবীন অধ্যাপকদের মাঝে এবং ১৪ জন মাননীয় ও তরুণ শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের পরে আবার গত ১ জুলাই থেকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছি। সকলের সহযোগিতায় বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তনী ও পরিচালন সমিতির সহায়তায় কলেজের পঠন-পাঠন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নতুন নতুন বিষয় সংযোজন, স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রবর্তন প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার বিষয়গুলি নিয়ে কলেজ এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করি।

বহু উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এই প্রতিষ্ঠান আজ বহু শাখা-প্রশাখায় বিকশিত হয়েছে। ভবিষ্যতের সুদূর-প্রসারিত পথে আবার তার যাত্রা শুরু হল। এমনিভাবে একদিন এই প্রতিষ্ঠান শতবর্ষের সোনালী পথে পৌঁছাবে— এই স্বপ্নকে বুকের মধ্যে লালন করে যাব আমরা। ■

ফিরে দেখা

প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী শান্তিরঞ্জন পাণ্ডে

খুব আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমাদের 'দুখুলাল নিবারণচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আজ কলেজের মহামিলনের দিন। পুরাতন ও নবীনের মহামিলন। সবাই জানে, অতীত কোনদিন ফিরে আসে না— যা গত হয় তা আসে না। (Past is gone forever and it will never come back)। কিন্তু একথা কী সত্য? সৎ (সত্য) কখন অসৎ হয় না। তাই আজ অতীত ও বর্তমান পরস্পরের সাথে মিশে গেছে।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসের সব খতিয়ান তুলে ধরা সম্ভব নয়। বহু ঘটনা ঘটেছে—কিছু অশুভ কিন্তু বেশির ভাগ শুভ। আমরা আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীদের চিরতরে হারিয়েছি। তাঁদের স্মৃতি, অধ্যাপনা ও কর্মজীবন—সবই মনে পড়ছে। কিন্তু সত্যকে তো স্বীকার করে নিতেই হবে।

কলেজ গড়ার পেছনে বহু শিক্ষানুরাগী শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জীবনের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করি। কলেজ ইতিহাসের পাতায় তাঁদের কর্মধারা উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করবে। সেই মহান ব্যক্তিরা হলেন : অশ্বিনী কুমার দাস, দিলীপ কুমার দাস, ম. হাজী নুরুল হক, সরোজ কুমার ভট্টাচার্য এবং বহু শুভানুধ্যায়ী মানুষ এবং মেহনতি শ্রমজীবীরা। তাঁরা সবাই প্রয়াত হয়েছেন। They are really great souls. They are still remembered with great reverena on account of their noble deeds.

সেইই শুভ জন্মদিন আগত হল :

ইং আগস্ট মাস, ১৯৬৭ সন "দুখুলাল নিবারণচন্দ্র" নামে আত্ম-প্রকাশিত হয়। শ্রী বিজন কান্তি বিশ্বাস মহাশয়ের ঔরসে কলেজের জন্ম হয়। বাগশিড়া পাড়ার 'গোডাউনে' ইঁদুরের উৎপাত তাপদাহ সহ্য করে আমরা সাতজন অধ্যাপক ক্লাস নিতাম। ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (ইতিহাস), শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), জগবন্ধু মণ্ডল (বাণিজ্য বিভাগ), শান্তি রঞ্জন পাণ্ডে (দর্শন), সুধারঞ্জন সেনগুপ্ত (ইংরেজি), বিশ্বনাথ রায় (বাংলা), জ্যোতিকুমার রায় (অর্থনীতি)। প্রথম তিনজন অধ্যাপক বহু পূর্বেই পরলোক গমন করেছেন। পিতা বিজন কান্তি বিশ্বাস এই শিশুকে চারাগাছে পরিণত করেন। তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেন নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বিজন কান্তি বিশ্বাস মহাশয় শুধু অধ্যক্ষ ছিলেন না, ছিলেন দক্ষ প্রশাসকও। তাঁর কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শান্তি, শৃঙ্খলা, শ্রী ও কল্যাণ। দুর্ভাগ্য ২ বৎসরের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। কলেজের ওপর তাণ্ডব ঝড় বয়ে যায়। তিনি মর্মাহত ও নিগৃহীত হয়ে কলেজ

ত্যাগ করে শ্রীপৎসিংহে পুনরায় যোগদান করেন। সেদিন তিনি শ্যামসুন্দর বাবুর হাতে কলেজের ভার তুলে দেন। সকলের পূর্ণ সহযোগিতায় তিনি পরিচালনা করেন। উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য।

বহুদিন প্রচেষ্টার পর একজন যোগ্য অধ্যাপক শ্রী কুমার আচার্য অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন। কর্মে ও আচরণে তিনি ছিলেন বিনয়ী মানুষ। তিনি প্রায়শই বলতেন, কলেজ তো বিজনদার। তাঁর চারাগাছকে সযত্নে লালিত পালিত করে শাখা-প্রশাখায় সম্প্রসারিত করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও বাণিজ্য বিভাগেও অনার্স খুলে কলেজকে প্রাণবন্ত করেন। কলেজ হোস্টেলের তাঁর কীর্তি বহন করছে। ফলে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কলেজ গতিশীল হয়। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা ভেঙ্গে পড়ি।

পরবর্তী অধ্যক্ষ শ্রী অনিল চন্দ্র গুহ। বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য তিনি তৎপর হন। বিজ্ঞান ছাড়া কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ছাড়া সমাজ সমৃদ্ধ হতে পারে না। বিজ্ঞান হল আলো এবং আলো জ্ঞান। সেই জ্ঞানে বক্ষ প্রকাশিত হয়। তাঁর এবং সকলের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে এতদঞ্চলের আমজনতার বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। তিনি বিজ্ঞানের পড়াশোনার পর মতিঝিল কলেজে যোগদান করেন অধ্যক্ষ হিসাবে।

সুদীর্ঘ বৎসর ধীরেনবাবু কলেজ পরিচালনা করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার সাথে কলেজের দায়িত্ব ভার বহন করেন।

পরবর্তী শ্রী আব্দুল ওয়াহিদ অধ্যক্ষ হন। দু'বছর প্রধান হিসেবে থাকার পর শ্রী শান্তি রঞ্জন মহাশয়ের হস্তে দায়িত্ব তুলে দেন। সেই সময় ছাত্রদের দাবি ছিল অনার্সের। সেই দাবি শান্তি রঞ্জন মহাশয় সবার চেষ্টায় সার্থক করেন। পরবর্তী অধ্যক্ষ হন শ্রীঅজিতবাবু। তিনিও কলেজের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন। পরবর্তী অধ্যক্ষ শ্রীতাপস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সব বিষয়ে অনার্স খুলে জ্ঞানের জানালা খুলে দেন। কলেজ পূর্ণত্ব লাভ করে।

তারপর স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন শ্রীতপনকুমার কর্মকার। তিনি ২ বছর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বহু অধ্যাপক ও কর্মীদের Service Book তৈরি করে Pension ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক ও কর্মী। বস্তুত, এই মহাবিদ্যালয় পালাবদলের কলেজ বললেও চলে। তবুও আমরা সফল ও সার্থক। শ্রী অজিত কুমার বাবু, শ্রী রামচন্দ্র দাস শিক্ষক মহাশয়ের ওপর ভার অর্পণ করেন। বর্তমান শ্রী নিখিলেন্দু বিকাশ দাস মহাশয় দায়ভার বহন করছেন। এইভাবে কলেজ পরিচালিত হয়ে আসছে।

শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আজ ব্যবসাবাণিজ্য। এ যেন এক নতুন পণপ্রথা (Dowry system)। পণপ্রথায় বধূ ছিল পণ্যদ্রব্য এবং এখনও এই লজ্জাকর প্রথা সমাজে নিন্দনীয়। বর্তমান শিক্ষা পণ্যদ্রব্য। এখন শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করতে অভিভাবকদের নাভিশ্বাস উঠছে। পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধুর সম্পর্ক নেই বললেই চলে। মনে রাখা দরকার, রাজনীতি বড় না। শিক্ষা অর্জন বড়। শিক্ষকদেরও নৈতিক দায়িত্ব বোধ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববদ্ধতা থাকা চাই।

ছাত্রদের বলতে চাই : We cannot all be politicians or lead millions of People. We cannot all be heroes and fight for freedom of the oppressed. But we can, each one of us, keep our environment fresh, clean and tidy. We can all be honest, truthful, humble, merciful and loving. They are the greatest things in life, because without them, the would will never be happier than its present condition.

হে শিক্ষাকর্মী, শিক্ষাব্রতী, শিক্ষাপ্রেমী, শিক্ষাদরদী, সুধীবৃন্দ— আজ সকলেই আসুন। আমাদের এই শিক্ষাভবনকে রাজনীতির বহু ঊর্ধ্বে নিয়ে যাই। দলমত নির্বিশেষে সম্মিলিত ভাবে এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে অঙ্গীকার বদ্ধ হই, কারণ এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে আমার কল্যাণ, আপনার কল্যাণ, সকলের কল্যাণ। হাজার হাজার নরনারীর কল্যাণ।

মা ভৈ : মা ভৈ : চরৈবেতি চরৈবেতি।।

তিনটি রম্যরচনা

অধ্যাপক সাধন কুমার দাস (বাংলা বিভাগ)

রবীন্দ্রচর্চায় খোলা হাওয়া

মনে করা যাক, 'রবীন্দ্রনাথ' নামে কোনো কবি কোনোদিন জন্মান নি। ওদিকে মেঘনাদ বধ আর এদিকে বনলতা সেন। মাঝখানটুকু একেবারে ফাঁকা। বড় গাছটা না-থাকায় উনিশ শতকের গীতিকবির দল মাচার উপর পুঁইশাকের মতো লকলকিয়ে উঠতো। আমরা পেছন ফিরে দেখতাম—ঈশ্বর গুপ্তের পৌষপার্বন, পাঁঠা, আনারস থেকে আজ অব্দি বাংলা সাহিত্যের বাগানে শুধুই ঝোপঝাড়, কাঁটালতা আর মাথার ধু ধু করা রুক্ষ, রোদ্দুর। তাহলে কোথায় দাঁড়াতাম আরাম? রৌদ্রদগ্ধ, যন্ত্রণাজর্জর এই জীবনের মাথার উপর স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়ে আমাদের প্রলম্বিত পথ-চলার ক্লান্তি দূর করতো কে? দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তানটির জন্মই যদি না হতো, তাহলে আমাদের জীবনবোধের ক্ষুদ্র পরিসরটুকুকে আদিগন্ত ব্যাপ্ত করে দিত কে?

যদি বলি, ডাকঘর, রক্তকরবী নামে কোনও নাটক লেখাই হয়নি কোনোদিন, তবে আমাদের রুগ্ন অমল কার প্রত্যাশায় জানালার পাশটিতে বসে থাকত? কোন্ সুধা তাকে রোজ রোজ ফুল জুগিয়ে যেত? নন্দিনীরা কোন রিক্ত মাঠে পৌষের গান গাইতে গাইতে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত, খুঁজেই পেতাম না কোনোদিন!!

রবীন্দ্রনাথ না থাকলে মিনির সঙ্গে রহমতের যে কোনোদিন দেখাই হত না, পোস্টমাস্টারের প্রতি নিষ্ফল অভিমানে বালিকা রতনও কেঁদে কেঁদে বেড়াত না। গিরিবালা, চন্দরা, রাইচরণ, চারুলতারা চিরকাল ঘুমিয়ে থাকত অলিখিত কোনো অন্ধকারে।

তাতে কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হত, আরামপ্রিয় ভেতো বাঙালির? মেট্রোরেল, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া, বইমেলা নিয়ে মহানগরীর জেল্লাই কিছু কমতো কি? না, বাইরের চেহারাটা হয়তো কিছুই বদলাতো না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে বাঙালির মন ও মনন অন্তত দু'শো বছর পিছিয়ে থাকত। কেননা, আমাদের হৃদয়ের অসংখ্য নিরালম্ব ভাব গুমরে গুমরে উঠত মনের ভেতরই, বাণীরূপ পেত না কোনোদিন!! তিনি না থাকলে এই জড়যন্ত্রণা থেকে কোনোকালেই মুক্তি পেতাম না আমরা এক উন্মুক্ত মহাকালিক চেতনায়। ডাল-ভাত-শুক্তো চচ্চড়ি আর দশটা-পাঁচটা বাঁধা রুটিন ছাড়াও যে আরেকটা অন্তহীন অধরা জগৎ আমাদের গায়ের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, আমাদের অকারণে উন্মনা উদাসীন করে আর মাঝে মাঝে কেমন অকারণ কান্না পায়—সেই কান্নার স্বরূপকে কেমন করে শনাক্ত করতাম আমরা, যদি 'গীতবিতান' নামে কোনও গানের বই-ই কোনোদিন না-লেখা হত? বৃষ্টিস্নাত বিষণ্ণ বিকেলের যে এক নিজস্ব ভাষা থাকে, শ্রাবণ-নির্ঝরিত সঘন গহন রাত্রির যে এক অলক্ষ্য মর্মবেদনা থাকে, তাকে কে উদ্ধার করত, যদি তিনি তাঁর নির্জন তানপুরায় সেই সুর সেধে না রাখতেন!!!

প্রবন্ধ, উপন্যাস, স্মৃতিকথা না হয় না-ই রইল, আমরা কোনো মূল্যেই হারাতে চাইব না তাঁর 'গানের ভুবনখানি'। তিনিই তো আমাদের দিয়েছেন এত বড়ো ছড়ানো আকাশ আর এক অনন্ত জীবনের স্বাদ। মাথার উপর থেকে যদি রবীন্দ্রনাথ সরে যান, তাহলে উন্মুক্ত আকাশটা যখন ছোটো হতে হতে বুকের উপর চেপে বসবে, তখন বাঁচার বিশল্যকরণী আর কে এনে দেবে আমাদের?

চাপ নেবেন না

আমার এক সহকর্মী ভাই আমাকে সামান্য উদ্বিগ্ন দেখলেই কাঁধে হাত রেখে বলে— 'আরেব্বা, কী এত ভাবছেন? একদম চাপ নেবেন না।' কথাগুলো শুনতে, বন্ধুর আশ্বাসে হালকা হই। মনে হয়, মনের মধ্যে গ্যাস বেলুনের মতো ফুলে ওঠা সব ভাবনা, একপাশে এক সুতোয় বেঁধে হাওয়ায় উড়িয়ে দিই আর একটা খেলনা পিস্তল দিয়ে পটাপট সবকটাকে ফাটিয়ে দিই, গুড়ুম—!!! নিকুচি করেছে জীবনের!! দু'দিনের দু'পয়সার এই খেলনা-জীবন, তাকে নিয়ে ভেবে ভেবে মরতে আমার বয়েই গেছে। আমার কলমটি দু'হাতে তুলে একেবারে মস্তানের মতো একটু ভেড়ে নিয়ে ফুরফুরে হাওয়ায় কাটা ঘুড়ির মতো দূর শূন্যে উড়ে যাই।

কিন্তু যাব কোথায় ভাই? যাব কোন চুলোয়? জীবনের সুতোটা যে সংসারের লাটাইয়ে বাঁধা আছে। সেখান থেকে যখন ঢেউ টান দেয়, তখন আবার চার দেওয়ালে বন্দী। বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-স্বজন, দায়িত্ব-কর্তব্য, সৌজন্য-লৌকিকতা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সবার হাতে কিছু কিছু দিতে হবে। তোমার নাভিশ্বাস উঠুক, তবু দিতে হবে। যাবে কোথায়? ঘাড় ধরে টেনে আনব না?

চারদিকে হাজারো রকমের চাপ। 'চাপ নেবেন না'—বললেই কি সব মিটে যায়? চাপ দিচ্ছে ফেলে আসা অতীতের কিছু স্মৃতি, কিছু দীর্ঘশ্বাস। বারবার আড়াল থেকে কে যেন টিপ্পনী কেটে বলছে— 'নিজেকে খুব চালাক ভাবো, তাই না? জীবনে কতগুলো ভুল করেছ, গুনেছ? আবার কি ইচ্ছে করে না জীবনের ভিডিওটা গোড়া থেকে [illegible] দিয়ে ভুলের জায়গাগুলো এডিট করে দিতে?

চাপ দিচ্ছে [illegible]

[illegible]

চাপ। তাই দুশ্চিন্তার মেঘ যখন মনের ঈশান কোণে জড়ো হতে শুরু করে, তখন আমি রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান খুলি, একটা ক'রে গান [illegible] উঠি রবীন্দ্রনাথের গান—"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে...।" তখনই মনে হয়—কোথাও কোনো চাপ নেই।।

খবর চাই, খবর

সব পাড়াতেই এমন একজন-দু'জন মানুষ থাকে, যাদের কাছে গ্রামের খুঁটিনাটি খবর কোন্ যাদুবলে সবার আগে এসে পৌঁছায়। চুপিচুপি বলি, আমার স্ত্রীও নাকি তার বাপের বাড়িতে মাত্র ঘণ্টাখানেক পাড়া বেড়িয়ে এলেই রাজ্যের খবর সংগ্রহ ক'রে আনতে পারত। সে বাড়ি ঢুকতেই ওদের বাড়ির কাজের লোকটি তার আঞ্চলিক ভাষাতে আমার শাশুড়িকে বলতো—'গেজেট আইস্যাছে মা' অর্থাৎ 'খবরের কাগজ চলে এসেছে'।

আমাদের পাড়ার চম্পার মাও সংবাদ সংগ্রহে দক্ষ মহিলা। বয়সের কারণে এখন আর ঘুরে বেড়াতে না পারলেও 'সংবাদ'ই নিজের পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে তার কাছে হাজির হয়। গোপালের মেয়ে যদি নেপালের ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তাহলে চম্পার মা জানবে সবার আগে। যখন মোবাইল ছিল না, জলধরবাবুর বড় মেয়ের ছোট দেওরের বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ামাত্র কোন্ অলৌকিক টেলিপ্যাথিবলে চম্পার মার কাছে সে খবর পৌঁছে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও, চম্পার মার রিপোর্টিংএর ঠেলায় সে আরো দু'দিন আই.সি.ইউ-তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। সেজন্যই তার চারপাশে পাড়ার খবর-বিলাসী মহিলারা সবসময় জটলা করে থাকে। চম্পার মা নিরক্ষর, কিন্তু সে এটা ভালো ক'রেই জানে যে শুকনো নীরস খবরের কোনো কদর নেই। ঠিকঠাক পরিবেশন করতে পারলে খবরও একটি পণ্য। শুকনো মুড়ি আর ক'জন চিবোতে চায়। তাই ঝালমুড়িওয়ালা শুকনো মুড়ির সঙ্গে একটু চানাচুর, দুটো ছোলাভাজা, একটু পেঁয়াজ কুচি-লঙ্কাকুচি, এক চামচ গুঁড়ো মশলা, এক রাউণ্ড সর্ষের তেল ঘুরিয়ে এক টাকার মুড়িকে দশ টাকায় বিক্রি করে। চম্পার মাও গোপালের মেয়ের পালিয়ে যাওয়ার নীরস খবরটুকু-তে আটকে থাকে না, তারা মাঝরাতে কোন ট্রেনে উঠে কোন স্টেশনে নেমেছে, পুলিশের হাতে পড়তে পড়তে কীভাবে বেঁচে গেছে, তার সৃজনশীল বর্ণনায় খবরটাকে মুখরোচক ও সুস্বাদু করে তুলতে জানে। চম্পার মা সত্যিই সত্যিই 'হাতে গরম' খবর বানায়। কাশীনাথের বেয়াইমশাই মারা যাওয়ার খবর যেদিন চম্পার মার মুখ থেকে পাড়ার লোক জানতে পারল, তার পাক্কা দু'দিন পর বেয়াইমশাই সত্যিসত্যিই মারা গেল।

আমাদের খবরের কাগজওয়ালারাও চম্পার মার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তারাও জেনে গেছে সাদামাটা শুকনো খবর চলে না। রসের ভিয়েনে ফেলে তাকে পাক ক'রে নিতে হয়। কোনোটা কড়া পাকের খবর, কোনোটা নরম পাকের খবর। যে-পাঠক যেমন চায় আর কি!! তাই বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সংবাদ চ্যানেলে একই খবরের এত বিচিত্রতা। যে-খবরটা একটা কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে গোল্লা গোল্লা ক'রে তাকাচ্ছে, আরেকটা কাগজে সেই খবরটা অণুবীক্ষণ নিয়ে দেখতে হয়। আজকাল কুকুরে মানুষকে কামড়ালেও 'প্রয়োজনে' তা 'খবর' হয়ে যায়, আবার কুকুরকে মানুষে কামড়ালেও অনেক সময় তা 'খবর' হয় না। বিশেষ পাঠক গোষ্ঠীর ইচ্ছে পূরণ করতেই খবরকে তাদের মনের মতো ক'রে সাইজ করা হয়। কেননা, এগরোল, চাউমিন, বিরিয়ানির মতো খবরও আজ বিক্রয়যোগ্য 'পণ্য'। কিছু করার নেই ভাই। পারো তো হাঁসের মতো জল কাটিয়ে দুধটুকু খেয়ে নিও।।

নারী শিক্ষার ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গ

ড. সুনীল কুমার দে (অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডি. এন. কলেজ)

সমাজের সম্পূর্ণতা নারী ও পুরুষের সহাবস্থানে। সমাজ গঠনে, দেশ-জাতির সার্বিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও অশেষ অবদানকে স্বীকৃতি দানে আমরা বাধ্য। নজরুল ইসলামের কথায় ব্যাখ্যা করা যায় নারীর অশেষ অবদান। তিনি নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সুউচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে তাই বলেছেন—"জগতের যত বড় বড় জয় বড় অভিযান, / মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।" শত-সহস্র বছরের সাধনার ধন নারী। আমাদের পারিবারিক জীবনবৃত্ত থেকে শুরু করে সমাজ-সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র যার অধিষ্ঠান সে তো নারী। সৃষ্টির সূতিকাগার থেকে শুরু করে সেই আদিম উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার সংস্কৃতির, শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্তে নারীর সম্মানের সিংহাসন অটুট। স্মরণের চলাচল সহজ সরল করে পিছন ফিরে, অতীতমুখী হলে দেখা যায় সেকালে নারী শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও সম্মানের সুউচ্চ সিংহাসনে সমাসীন। সীতা-সাবিত্রীর দেশ আমাদের এই দেশ। গার্গী, মৈত্রেয়ীরা আমাদের গর্বের মহীয়সী নারী। এখানে আত্রেয়ী, অপালা, লীলাবতী, লোপামুদ্রা, সুলভা, সাবিত্রী, কণ্ব, কামজানি, ব্রহ্মবাদিন, বেদবতী, বিশ্ববারা, ঘোষা, শ্রদ্ধা, পৌলমীর মতো উচ্চশিক্ষিত, অসাধারণ পণ্ডিত্যের অধিকারী নারীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। কোথাও তাঁরা বেদমন্ত্রের রচয়িতা আবার কোথাও তাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানের পৌরোহিত্যে অনন্যা। শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারায় এই সব নারী ইতিহাসের পাতায় আজও স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। অতীত ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতবর্ষে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারাপাত লিখনে নারীর অবদানকে কোনক্রমে উপেক্ষা করা যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে সেকালে নারীর অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধির জন্য আমাদের অবশ্যই সনাতন ভারতবর্ষের তপোবনীয় অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আলোকপাতের একান্তরূপে প্রয়োজন।

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিশ্ব আজ অবহিত। সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। গঙ্গা-যমুনা-সরযূর অববাহিকা অঞ্চলে আর্য সভ্যতার ক্রমবিকাশ। তপোবনীয় এই সভ্যতা আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত। সেই যুগ থেকেই আমাদের শিক্ষার ইতিহাসের যথার্থ সূচনা। বৈদিক ও তৎপরবর্তীকালের হিন্দুসমাজ শিক্ষা-সংস্কৃতির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আত্মজ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধিই যে শিক্ষার চরমতম ও পরমতম লক্ষ্য একথা আর্য ঋষিকুলের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। সত্যোপলব্ধির সাধনায় তাঁরা সদাসর্বদা সক্রিয়। তাঁরা মনে করতেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানুষ এই সাধনায় নিয়োজিত। গুরুবাদী শিক্ষায় তাঁরা বিশ্বাসী। শিক্ষাদান, গ্রহণ, সম্প্রসারণ সর্বক্ষেত্রে তাঁরা নারী-পুরুষের সহাবস্থান ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা উচ্চারণ করেছেন। নারী ও পুরুষের মধ্যে সেখানে কোনো বিভেদরেখা টানা হোত না। শিক্ষা সহ সর্বক্ষেত্রে সে যুগে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে।

নারীশিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারায় বৈদিক যুগের গুরুত্ব অবিস্মরণীয়। সেই যুগকালে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নর নারীর সমানাধিকার ছিল। যাগ-যজ্ঞ, বেদপাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ সর্বক্ষেত্রেই তখন পুরুষের পাশাপাশি নারীরও অংশগ্রহণের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যজ্ঞকালে পত্নীর উপস্থিতির প্রসঙ্গে নারীর অধিকার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। নারীদের উপনয়ন প্রসঙ্গ এবং যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রামাণ্য তথ্য মেলে। গুরুকুলীয় শিক্ষায় মেয়েরা গুরুগৃহে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করত। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের শিক্ষা-জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে তবেই তাদের বিবাহোত্তর জীবনের ছাড়পত্র দেওয়া হোত। সেকালে মেয়েরা গূঢ় তত্ত্বের নানা আলোচনায় তর্ক-বিতর্কেও অংশগ্রহণ করত। মৈত্রেয়ী, প্রাণিতেয়ী,

পুরাণে, কাশকৃৎস্নী প্রভৃতি বিদুষী মহিলারা ব্রহ্ম সম্পর্কিত গূঢ় তত্ত্ব আলোচনায় তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার অসাধারণ স্বাক্ষর রেখেছেন। সে যুগে মহিলারা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত যে থাকত তা অনুমান এ প্রমাণ করা যেতে। অধ্যাপিকাদের অধ্যাপনার কথা সেকালের নানা গ্রন্থ থেকে অবগত হওয়া গেছে। কেবল শাস্ত্র-সাহিত্যের সঙ্গে নয় সেকালের নারীরা নৃত্যকলায়, সংগীত ও নানা বাদ্যে পারদর্শিনী। এ বিষয়ে 'বৈদিক সমাজ ও শিক্ষার স্বরূপ' প্রবন্ধে আলোচ্য বলা যায়— "বৈদিক সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে।... নারীরা শুধু শিক্ষাগ্রহণ করতেন না, তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টাও ছিলেন।... তাঁরা বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন।... নৃত্য, গীত ও বাদ্যে বৈদিক যুগে নারীদের পারদর্শিতার কথা জানা যায়। যজন, যুদ্ধবিদ্যা ও অন্যান্য চারুশিল্পে মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণ করত।... বাৎস্যায়নের কামসূত্রে মেয়েদের ৬৪ কলা শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।" চিত্রাঙ্কন, নাটক, কবিতা রচনা, নানা ক্রীড়া প্রসঙ্গে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রটি সেকালে স্পষ্টরূপে বুঝে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

যুদ্ধবিগ্রহ সেকালে লেগেই থাকত। ফলে আত্মরক্ষার্থে সমরশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে মেয়েরাও পিছিয়ে ছিল না। প্রয়োজনে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করত। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে বর্শা নিক্ষেপকারিণী নারীর কথা উল্লেখ করেছেন। গুপ্তযুগীয় বৃত্তিশিক্ষাতেও নারীদের পারদর্শিতা অর্জনের কথাও সেকালের ইতিবৃত্তে জানা যায়। তীর নারীদের সমরাঙ্গনে যেমন দেখা যেত তেমনি দেহরক্ষিণীর কাজেও তাদের নিযুক্তির প্রমাণ মেলে।

জ্ঞানের আলো প্রসারিতকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম গ্রন্থ। সে যুগে নারীরা অধ্যাপনার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনাতেও ব্রতী। কাশকৃৎস্নী মীমাংসা শাস্ত্রের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাকরণের উপর পুস্তক রচনা করেছেন ব্রাহ্মণী আপিশলি। অভিজাত পরিবারের মেয়েদের পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা সেকালে ছিল। সাহিত্য রচনায় অনেকের অসাধারণ মুন্সিয়ানা প্রদর্শিত হয়েছে। মহিলা কবিদের কবিতা সংগৃহীত হয়েছে হালের গাথাসপ্তশতীতে। মোটকথা বেদের যুগে নারীশিক্ষার শর্তমুক্ত একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল বলে নিশ্চিতভাবে প্রামাণ্য তথ্য প্রদত্ত। বৃত্তিশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, সমরশিক্ষা, নৃত্য-গীত-বাদ্য শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষার সঙ্গে বৈদিক যুগের নারীদের আত্মিক যোগ ছিল। নারীশিক্ষা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অধ্যাপক রণজিৎ ঘোষের কথা দিয়ে বলা যায়— "মেয়েরা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে বলে বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বর্শা নিক্ষেপকারিণী শাক্তিকী নামে নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে যোদ্ধার বেশে সজ্জিতা বীর নারীদের দেখেছেন। নারীরা অন্তঃপুরে দেহরক্ষিণীর কাজ করত। যুদ্ধকালে নারীরা পথ্য ও পানীয় দিয়ে আর্তের সেবা করত।... নারীরা অধ্যাপনা করতেন; তাঁরা পুস্তক রচনাও করেছেন।"

বৈদিক সমাজ নারীকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে বসিয়েছিল, উপনিষদ ও মহাকাব্যের যুগেও সেই শ্রদ্ধা-সম্মান অটুট ছিল। বিশ্বখ্যাত মহাকাব্যগুলির মধ্যে নারীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সিংহাসন অটুট থাকার পরিচয় অজস্র ধারায় পাওয়া যায়। স্মৃতির যুগ-প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ার পর থেকে ক্রমে ক্রমে নারী সমাজকে এসব থেকে ব্রাত্য করার আয়োজন চলতে থাকে। মেয়েদের উপনয়নের অধিকার, বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অধিকার ক্রমে ক্রমে কেড়ে নেওয়া হোল। বাল্যবিবাহের প্রচলন করে নারীকে অন্তঃপুরবাসিনী করে নানা বিধিনিষেধের অবরুদ্ধ করে রাখার বিধান প্রদত্ত হোল। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় মনুসংহিতার বিধান— "নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকবে।... মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে বেদ অধ্যয়নের সমান। স্বামীর সেবা আর আশ্রমে বাস করা এক এবং গৃহকার্য করাই হচ্ছে সন্ধ্যাবন্দনা।" ব্রাহ্মণ্যশক্তির উত্থানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে পুরুষের অধীন করে রাখার সর্ববিধ ব্যবস্থা করে ফেলে সমাজের রক্ষণশীল রক্ষকেরা। হিন্দু যুগের অবসানে শিক্ষা ও সমাজে নারীর অবস্থা আরও করুণ, মর্মান্তিক ও শোচনীয় হয়ে ওঠে। মুসলিম যুগে হিন্দু সমাজে ব্যাপকভাবে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ অন্তঃপুরবাসিনীদের অর্থাৎ নারীদের শিক্ষাচেতনার আলো থেকে বঞ্চিত করে অনেক দূরে অশিক্ষার অন্ধকূপে ঠেলে ফেলা হয়। হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা সমাজে নারীর সম্ভ্রমের স্থানকে অবনমিত করে। সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে নারীশিক্ষার বেহাল দশা চোখে পড়ে। বহুক্ষেত্রে দেশীয় স্কুলগুলিতে অনুপ্রবেশের অধিকারও দেওয়া হয়নি। অক্ষরজ্ঞানের অধিকারও অস্বীকার করা হয়েছে বহুক্ষেত্রে। সাধারণভাবে নারীসমাজ এই সময় শিক্ষাচেতনা থেকে বঞ্চিত হলেও কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র চোখে পড়ে। ধনিক-বণিক পরিবারের বহু বনেদী অভিজাত পরিবার গৃহশিক্ষিকা রেখে মেয়েদের পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সব অভিজাত পরিবারের নারীদের অনেককে সাহিত্যচর্চা, কাব্য রচনাতেও যুক্ত থাকতে দেখা যায়। তবে একথা সত্য তাদের সংখ্যা কোটিকে গুটিক।

আধুনিক যুগের নারীশিক্ষা প্রাসঙ্গিকতায় উত্তরণ করে আমরা তাকে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করতে পারি। বিভাগগুলি হোল—

ক) প্রাক্-স্বাধীনতা বা স্বাধীনতা — পূর্ববর্তী যুগের নারীশিক্ষা

খ) স্বাধীনোত্তর বা স্বাধীনতা — পরবর্তী যুগের নারীশিক্ষা

ক) স্বাধীনতা - পূর্ববর্তী (১৮১৮ — স্বাধীনতাকাল) যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার সেরকম কোনো ব্যবস্থা সবার জন্য চোখে পড়েনি। ঘরোয়াভাবে পরিবারজীবনে সামান্য লেখাপড়ার সুযোগ কেউ কেউ পেত। এদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। তারাই প্রথম উপলব্ধি করলো নারীকে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা। এই মিশনারীরা আধুনিক যুগে সর্বপ্রথম নারীর অধিকার, নারীর মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নারীর শিক্ষাদানের ব্যাপারে সচেতনতা, প্রাসঙ্গিকতায় সোচ্চার হতে থাকে। 'স্বাধীন ভারতে শিক্ষার বিকাশ' গ্রন্থের নারী শিক্ষা প্রবন্ধে এ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত থেকে কিছুটা অংশে প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করা যেতে পারে : "মিশনারীরাই আধুনিক যুগে প্রথম নারীর মর্যাদা, নারীর শিক্ষা বিষয়ে সোচ্চার হলেন। তাঁরা বললেন যে, শিক্ষাই নারীকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সম্মানজনক জীবন নির্বাহের মতো আত্মসচেতনতা এবং সামাজিক মর্যাদা দিতে পারে।" স্কুলের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়ায় রেভারেন্ড মে কর্তৃক একটি স্কুল খোলা হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আনানোর জন্য বিনামূল্যে বই সহ নানা শিক্ষা

উপকরণ এমনকি পোশাকও বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন পুরস্কারও উদারভাবে বণ্টন করে মেয়েদের স্কুলে আনার ব্যাপারে উৎসাহী করা হয়। শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাস বলে—এটিই আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ শিক্ষাপ্রদানের জন্য প্রথম মেয়েদের স্কুল। না, স্কুলটি বেশিদিন সচল থাকে নি; কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল তার অস্তিত্বের বিপন্নতা। সময়কাল ১৮১৯ সাল। উইলিয়াম কেরী সাহেবের মাধ্যমে শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হোল মেয়েদের একটি স্কুল। নারীশিক্ষার প্রসারে এবার নারীদেরই এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ব্যাপটিস্ট মিশনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ইংরেজ মহিলারা নারী শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মিসেস্ পিয়ার্স ও মিসেস লসনের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হোল ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি। এই প্রতিষ্ঠানটির নামিক পরিচিতি থেকে বোঝা যায় নারীশিক্ষার প্রসার নারীদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই এর সূত্রপাত। "The Female Juvenile Society fro the establishment and support of Bengal Female School" নাম থেকেই প্রতিষ্ঠানটি উদ্দেশ্য-অভিলাষ প্রসঙ্গ উপলব্ধি করা যায়। যতদূর জানা যায়, এই প্রতিষ্ঠান ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ২০টি স্কুলের পরিচালনার দায়দায়িত্ব নিয়েছিল। ১৮৩২-এ নামবদল করে (The Calcutta Baptist Female School Scoeity) ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমিতিটির সক্রিয় থাকার ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। British and Foreign School Society ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে মিস কুককে ভারতে পাঠায়। মিস কুক, রেভারেন্ড মে, উইলিয়াম কেরী, মিস কার্পেন্টার, লেডি আমহার্স্ট প্রমুখ শিক্ষানুরাগী মহিলাদের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি (৮টি) নারী বিদ্যালয় অনাথ আশ্রম এবং একটি মহিলা শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষানিকেতন গড়ে তোলা হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের সহায়তা নিয়ে কুড়ি হাজার টাকার সাহায্যে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার নাম সেন্টাল স্কুল। এখানেই শিক্ষিকাদের শিক্ষণ শিক্ষার তথা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে এই স্কুলের গৃহে স্কটিশচার্চ কলেজের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ চালু হয়।

নারী শিক্ষার প্রসারে সরকারেরও যে একটা দায়-দায়িত্ব আছে সেই দায়বদ্ধতার কথা উডের ডেসপ্যাচের আগে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়নি। নারী শিক্ষার প্রসারে তখনও পর্যন্ত সরকার কোনো আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ করেনি। মিশনারী এবং কিছু বেসরকারী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে স্ত্রী শিক্ষার কিছুটা অগ্রগতি দেখা দেয়। কলকাতায় আসা মিশনারীদের উদ্যোগে বেসরকারি-ভাবেও মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের মাধ্যমে নারী শিক্ষার ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছিল। Calcutta Female School পরবর্তীতে যা বেথুন স্কুল নামে খ্যাত তা এ সময়েরই সার্থক রূপায়ণ। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার প্রসারে ৪০টির মতো স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। বাংলায় স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর এবং বেথুন স্কুলের অবদানের কথা স্মরণ করে বলা হয় এঁদের মাধ্যমেই বাংলায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত ঘটে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এই স্কুল কলেজস্তরীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এই বেথুন কলেজই প্রথম মহিলা কলেজের সম্মান প্রাপ্ত কলেজ।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ নারী শিক্ষার প্রসার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এক সময়কাল। এই সময় উডের ডেসপ্যাচের পর ভারতবর্ষে মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে যুগান্তকারী এক অধ্যায় রচিত হয়। উডের ডেসপ্যাচই প্রথম স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতিতে সরকারের দৃষ্টি ও সহায়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর পূর্বে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় এবং মুসলিম সম্প্রদায় কোনো উদ্যোগ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। ফলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা দৈন্যদশা এতদিন লক্ষ্য করা যেত। সেদিক থেকে উডের ডেসপ্যাচের প্রশংসা না-করে পারা যায় না। নারী শিক্ষার প্রসার প্রসঙ্গে সমাজের মূল দৃষ্টি, সম্প্রদায়ের বিরূপ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও কিছু প্রগতিপন্থী সমাজহিতৈষী মনীষী মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় মিস কার্পেন্টারকে এদেশে নারী শিক্ষার বিস্তার প্রসঙ্গে উৎসাহী করে তোলেন। ফলে মহিলাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করে খোলা হয় শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ ব্যাপারে মিস কার্পেন্টারকে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের প্রথম পুরোহিত বা অগ্রদূত বলে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রাক-স্বাধীনতার সময়কালে স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার যে ঘটেনি তা আমরা মোটামুটিভাবে অবগত হতে পারি। নানা অসুবিধা, বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মূলতঃ মিশনারীদের উদ্যোগে, মনীষীদের উৎসাহ সর্বোপরি কিছু শিক্ষানুরাগী মহাপ্রাণের অবদানে নারী শিক্ষার পথ প্রসারিত হতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নারী শিক্ষা ও অন্যান্য নানা অধিকার আদায়ের জন্য যেন বলতে চেয়েছিল— "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার/হে বিধাতা?" কিংবা "যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী—/আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।" অথবা— "হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা—/রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।" পুরুষ শাসনত নারী শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে তাদের অধিকারের দাবি সনদ নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য তীব্রভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। সরকার স্ত্রী শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য ত্যাগ করলে নারী শিক্ষার প্রসার প্রসঙ্গটি আরো গুরুত্ব পেতে শুরু করে। উচ্চশিক্ষার বাধা যা মহিলাদের ক্ষেত্রে আরোপিত ছিল তাও কাটতে শুরু করে।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার বাধা কাটানোর ছাড়পত্র দিলে চন্দ্রমুখী বসু এবং কাদম্বিনী বসু প্রমুখ ভারতীয় মহিলা হিসাবে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এই ডিগ্রি অর্জিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

স্বাধীনতা (১৯৪৭) - পরবর্তী যুগ

সময়কাল ১৯৪৭ সাল। এলো ভারতবাসীর পরম কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এডামের রিপোর্টে নারী শিক্ষার বিশেষ কোনো বার্তা ছিল না। উডের ডেসপ্যাচে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে—রাষ্ট্র তথা সরকারের নারী শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন ও তৎপর হওয়া খুবই জরুরি। এদেশে যেখানে নর নারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান সেখানে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা না করার অর্থ অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে অশিক্ষার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া। ১৯৪৭ এর পর অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর ভারতে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ১৬ নং ধারায় নারী পুরুষের শিক্ষার সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, নরনারী সকলেরই সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আমাদের সংবিধানে স্বীকৃতি পায়। শিক্ষাসচেতন সুধীজন, সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষানুরাগী মানুষজন, নানা কমিটি-কমিশন, সমাজসেবী সংস্থা সকলে স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনকে মান্যতা দিতে থাকে এই সময়কাল থেকে। ১৯৪৮-৪৯-এ রাধাকৃষ্ণণ কমিশন শিক্ষা কর্মসূচীতে নারীদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের সুব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের মতো মহিলাদেরও সমসুযোগ প্রদানের কথা এখানে বলা হয়। নাগরিক হিসাবে মহিলাদের পৃথক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভেবে তাদের বিশেষ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থার উপর জোর দেয় এই কমিশন। মেয়েদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, গৃহী প্রশাসনের ক্ষেত্রে এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে যাতে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়।

১৯৫২-৫৩ তে এলো মুদালিয়ার কমিশন। এই কমিশনের শিক্ষাক্ষেত্রে মূলকথা—স্ত্রীশিক্ষায় আলাদা কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই; পুরুষেরা যে সব সুযোগসুবিধা পায় সেগুলি যেন নারীও পায়। পারিবারিক জীবনে মেয়েদের ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই কমিশন সঙ্গীত-কলা ও গার্হস্থ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু দিক নারীশিক্ষা পাঠক্রমে সংযোজনের সুপারিশ করে। শিক্ষাদান, শিক্ষা পরিচালনায় উপযুক্ত সংখ্যক নারী-প্রতিনিধি রাখার কথা এই কমিশনে বলা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার নারীদের শিক্ষার লক্ষ্যে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। এই National Committee on Women's Education ১৯৫৯ সালে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করে। সুপারিশগুলি হোল :

১। সমস্যা সঙ্কুল আমাদের দেশ ভারতবর্ষের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সমস্যার নিরিখে একটি প্রধান সমস্যা হোল নারী শিক্ষা। এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধানকল্পে সাহসের সঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয়শীল এবং বলিষ্ঠ শক্তিশালী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্তরূপে আবশ্যক।

২। নারী শিক্ষার যথার্থ প্রসারে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে National Council for the Education of Girls and Women এবং রাজ্যস্তরে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে নারী শিক্ষার যথার্থ ক্রমবিকাশে State Council গঠন করতে হবে।

৩। নারী শিক্ষার যথার্থ অগ্রগতি ও সামগ্রিক প্রসারের দিকে দৃষ্টি রেখে কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিভাগে যুগ্ম শিক্ষা পরামর্শদাত্রীর অর্থাৎ Joint Education Advisor-এর হাতে স্ত্রী শিক্ষার দায় দায়িত্বভার অর্পণ করতে হবে।

৪। নারী শিক্ষার অজস্র সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন থেকে তার সমাধানী সূত্র সংকেতের পন্থা বের করে যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে।

৫। প্রত্যেক রাজ্যে নারী শিক্ষার দায়িত্ব একজন মহিলা শিক্ষাবিদের উপর ন্যস্ত করতে হবে। তার জন্য রাজ্য পিছু একজন মহিলা যুগ্ম শিক্ষা অধিকর্ত্রী অর্থাৎ Joint Educational Director পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৬। নারী শিক্ষার যথার্থ সম্প্রসারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অতিরিক্ত দশ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে। সেই সঙ্গে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষিকা নেই সেখানে অবশ্যই একজন করে School Mother অর্থাৎ গুরুমা নিয়োগ করতে হবে।

৯। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম থাকলেও মেয়েদের জন্য সেলাই এর কাজ, শিল্প অঙ্কন এবং হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০। মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রমের ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অবশ্য উভয়ের পাঠক্রমে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতার স্বীকৃতি নেই।

১১। মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের কথা মাথায় রেখে পাঠক্রমকে পরিবর্তী করার সুপারিশ করা হয়েছে।

১২। রাজ্য সরকার শিক্ষিকাদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষানিকেতন তৈরি করে যেখানে শিক্ষিকাদের সংখ্যা কম সেখানে আরো বেশি শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করবে।

১৩। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মেয়েদের উৎসাহী করে তোলার জন্য ভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠার কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪। বয়স্ক মহিলারা যারা কোনো কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের শিক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্স প্রবর্তনের কথা এখানে বলা হয়েছে।

১৫। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য এই কমিশন বিশেষভাবে ভাবিত। অভাবী পরিবারের মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বই-বৃত্তি প্রদানের কথা এই কমিশন বিশেষভাবে ভেবেছে।

১৫। নারীশিক্ষার ক্রমবিকাশে ছাত্রীনিবাস তৈরি, যাতায়াতের সুবিধা প্রদান এবং বিনামূল্যে টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা এখানে উল্লেখ্য।

১৬। মেয়েদের যেহেতু ঘর-গৃহস্থালি সামলাতে হয় সেই কারণে গৃহকর্ম ও শিক্ষকতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে মহিলাদের আংশিক সময়ের শিক্ষিকারূপে নিয়োগের কথাও এখানে বলা হয়েছে।

১৭। জাতীয় নারীশিক্ষা কমিটি শিক্ষিকাদের চাকরির উন্নতির জন্য অধিকতর বেতন প্রদানের সুপারিশ করে। তারা ট্রিপল বেনিফিট স্কীম চালুর সুপারিশও করে।

১৮। নারীশিক্ষা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির কথাকেও এখানে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কালে নারী শিক্ষার প্রসার ও সমুন্নতির জন্য একাধিক শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে রেখে এক-একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতি হংসরাজ মেহতাকে মাথায় রেখে একটি কমিটি গঠন করে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু সপারিশ করা হয়। এই কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও সর্বভারতীয় ভিত্তিকে স্ত্রী শিক্ষার অভিপ্রেত আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি না ঘটায় আবার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হয়। বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েদের কথা বেশি করে ভাবা হয়। গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার হাল প্রত্যক্ষ করে ভক্তবৎসলমের নেতৃত্বে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে একটি সাব-কমিটি গঠন করে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুপারিশ প্রদত্ত হয়। এই কমিটির সুপারিশ সমূহ জাতীয় নারীশিক্ষা পরিষদ গ্রহণ করে এবং কোঠারী কমিশনের কাছে সেগুলি বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতিটি গৃহীত হয়। এখানেও নারী শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়।

নারী শিক্ষার সামগ্রিক বিকাশে নানাবিধ সুপারিশ ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও এখনও আমরা প্রত্যাশিত ফল পেয়েছি বলে মনে হয় না। সমস্যার বিচারে ভারতের নারী শিক্ষার হাল বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। শহর এলাকায় নারী শিক্ষার হাল কিছুটা আশাপ্রদ হলেও গ্রামাঞ্চলে এখনও নারী শিক্ষার প্রত্যাশিত প্রসার ঘটেনি। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগের যথার্থ সমন্বয় ব্যতীত নারী শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যে অসম্ভব তা বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি ও শিক্ষানুরাগীদের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। ধর্মীয় কুসংস্কার, অনুন্নত সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলতা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে বহুক্ষেত্রে। গ্রামীন স্কুলগুলিতে শিক্ষিকাদের অভাবও অনেক ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার অগ্রগতির সোপান নির্মাণের বড় অন্তরায়রূপে দেখা গেছে। ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির নারীশিক্ষা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে আলোকপাতে দেখা যায় কোনো কোনো রাজ্য অনেকটা অগ্রসর হলেও অনেক রাজ্য বহু বেশি পিছিয়ে আছে। নারী শিক্ষার প্রসারে পশ্চিমবঙ্গ নানা সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও তা কাগজে কলমেই থেকে গেছে। তাই আমাদের রাজ্যের নারী শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনায় হতাশাজনক পরিনামই প্রাধান্য পেয়েছে। একটা সময় শিক্ষায় বিশেষত নারী শিক্ষায় বাংলাকে অনেকে অনুকরণ করলেও, অনুসরণ করলেও বর্তমানে বাংলা নারী শিক্ষায় বহু রাজ্যের পিছনে চলে গেছে। এ বিষয়ে রণজিৎ ঘোষের তথ্যসমৃদ্ধ ভাবনাসূত্র থেকে কিছু কথা তুলে ধরা যেতে পারে—"পশ্চিম বাংলার নারী শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা অত্যন্ত হতাশাজনক। একসময়ে বাংলাদেশ ছিল শিক্ষায় সবচেয়ে অগ্রবর্তী। নারী শিক্ষায় সব প্রদেশ বাংলাদেশকে অনুসরণ করত। বর্তমানে বাংলা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু রাজ্যের পিছনে। সাক্ষর নারীর সংখ্যা বিচারে পশ্চিম বাংলার স্থান ৭ম। কেরলে ৬-১১ বছরের সব মেয়েই বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। মাদ্রাজ ও মহীশূরে ৬৩% মেয়ে সুবিধা পাচ্ছে। পঃ বাংলায় ৬ -১১ বছরের মেয়েদের ৫০.৭% প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।.... নারী শিক্ষিতের হার কম হবার জন্য পঃ বাংলায় মোট শিক্ষিতের হার স্বাভাবিকভাবেই নিচের দিকে রয়েছে।"

সমস্যা যখন উদ্ভূত হয় তখন তার সমাধান পথ উদ্ভবের জন্যও পর্যাপ্ত প্রয়াস নেওয়া হয়। সমস্যা জর্জরিত আমাদের স্বদেশভূমির অন্যতম একটি সমস্যা নারীশিক্ষা প্রাসঙ্গিক সমস্যা। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ, সমাজসেবী সংস্থার প্রয়াস' সর্বোপরি শিক্ষানুরাগী সুধী সমাজ ও জনসাধারণ স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করলে সমস্যাটির অনায়াস সমাধান সম্ভব হবে। আশাবাদী আমরা। এখনো আমরা আশা করি গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, পৌলমীদের এই দেশ নারী শিক্ষায় সমুন্নতির শীর্ষ সোপান গড়ে তুলে আমাদের এই দেশকে সকল দেশের সেরা করে তুলতে পারবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা নারীশিক্ষা প্রদীপ্ত প্রোজ্জ্বল দীপশিখাকে আরো সমুজ্জ্বল করে তারা এমন একটি স্বদেশভূমি গড়ে তুলুক যা নারী শিক্ষায় বিশ্বের কাছে অতুলনীয়, অনন্যা হয়ে দেখা দেবে। আমরা সেই প্রত্যাশার পথ চেয়ে চূড়ান্ত ঔৎসুক্য নিয়ে প্রতীক্ষারত থাকতে চাই। আর তোমরা আজ যারা শিক্ষক-শিক্ষণের শিক্ষার্থী বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষণে যুক্ত আগামী দিনের শিক্ষিকা তোমরাই এই অসাধ্য সাধনে নিশ্চিতভাবে সফল হবে, সফল হবে এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস রেখে আমার কথা শেষ করলাম।

প্রসঙ্গ : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'

অধ্যাপক মাসুদ রানা (অতিথি অধ্যাপক)

"কী পশ্চিমবঙ্গ কী বাংলাদেশ সবটা মেলালে তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক।
ইলিয়াসের পায়ের নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলে আমি ধন্য হতাম।"

— মহাশ্বেতা দেবী

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তিনি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব মাধ্যমেই একজন স্বল্পপ্রজ লেখক। এই স্বল্পতার মধ্যেই তিনি একজন নন্দিত ও জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। দুইটি উপন্যাস, গোটা পাঁচেক গল্পগুচ্ছ আর একটি প্রবন্ধ সংকলন এই নিয়ে তার রচনা সম্ভার। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে রয়েছে গভীর জীবনবোধ। সব বিষয়কে তিনি বৃহত্তর জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্রতায় দেখেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন —

> "কান টানলে মাথা আসে, ব্যক্তির জীবন বলতে গেলে চলে আসে সমাজ। সমাজের বাস্তব চেহারা তুলে ধরতে হয়; শুধু স্থির চিত্র নয়, তার ভেতরকার স্পন্দনটিও বুঝতে পারা কথা—সাহিত্যিকের প্রধান লক্ষ্য।"

—তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই'। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির আলোকে তিনি রচনা করেন উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের পটভূমি ১৯৬৬ সালের ২৩শে এপ্রিল থেকে ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবর রহমানের জেলবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তির সময়কাল পর্যন্ত। প্রায় তিন বছর ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের মুক্তির আন্দোলনের বিরামহীন প্রয়াস জারি রাখেন। তিনি সরকারের কাছে ছয়দফা দাবী পেশ করেন। কিন্তু তাঁর দাবী শাসকবর্গের কাছে রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে মনে হয়। ফলস্বরূপ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন আইয়ুব শাহী সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিছিল, ধর্মঘট, রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত ও অসংগঠিত ভাবে হতে শুরু করে। বেওয়ারিশ শিশু উপন্যাসে যারা 'পিচ্চি' বলে পরিচিত তারাও এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ময়লা জামা কাপড় পরা হতদরিদ্র মানুষগুলোর আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের কথা এবং তাদের মার খাওয়ার কথার লেখক উপন্যাসটিতে তুলে ধরেছেন।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম লেখা শুরু হয় 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি। প্রথম প্রকাশকালে উপন্যাসটির নাম ছিল 'চিলেকোঠায়'। কিন্তু কিছুটা লেখার পর আশির দশকের শুরুতে 'রোববার' নামীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে উপন্যাসটি। পরবর্তীকালে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে 'ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড' থেকে

গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'চিলেকোঠার সেপাই'। এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য—

"সংবাদে ছাপা হয়েছিল, চিলেকোঠার সাথে,
পরে এটাকে একটু সংকুচিত করে 'চিলেকোঠার সেপাই' দিলাম।"

—বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে পিতা বি.এম. ইলিয়াসকে। ১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়—এরপরই জুন মাসে কলকাতার 'নবজাতক প্রকাশনী' থেকে বইটির কলকাতা সংস্করণ বের করা হয়। সাধারণত 'চিলেকোঠা' দেখা যায় বাড়ির ছাদে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। আর 'সেপাই' অর্থ সৈনিক বা প্রহরী। ঊনসত্তরের সংগ্রাম ও মিছিলে উত্তাল ঢাকা শহরে আত্মনিমগ্ন ওসমান কেমন প্রবল মানুষ গণআন্দোলনের টানে কীভাবে চিলেকোঠার বিচ্ছিন্ন জগৎ থেকে বের হয়ে আসে উপন্যাসে সেকথাই বর্ণিত হয়েছে।

উপন্যাসের পটভূমি কারফিউ ঘোষিত ঢাকা শহর। কারফিউ ঘোষণার পর রাস্তাঘাটের মানুষ রুদ্ধশ্বাসে পা চালায় বাড়ি ফেরার জন্য। তাদের চোখে মুখে উদ্বিগ্নতা। পুলিশের গুলির শব্দে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়। সামরিকবাহিনীর হাতে রাত্রির গভীরে নারীদের লোভীদের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে, কত নারী নীরব হয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারে। উপন্যাসে রহমতুল্লা ও খিজিরের মায়ের প্রসঙ্গে এই দিকটা বেশ স্পষ্ট হয়েছে। এই গণআন্দোলনে আশ্রয়হীন খিজির দল বাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের এই সব আন্দোলনে হরতাল ও ধর্মঘটে এলার্জি। তারা সমাজের সব সুবিধা ভোগ করে অথচ দুর্ভোগ ভোগ করে সমাজের প্রান্তবাসীরা। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

"ভদ্রলোক ও ছাত্রদের বেশির ভাগই বলতে গেলে প্রায় সবাই
একটা আধটা লাঠির বাড়ি খেয়ে
কিংবা মার এড়িয়ে কেটে পড়েছে। এখন বাকি রইল নোংরা কাপড়
পরা লোকজন এবং
অশিক্ষিত পিচ্চি।"

—ঔপন্যাসিকের ঘটনাপ্রবাহ দুটি সমান্তরাল রেখায় বিন্যস্ত হয়েছে। একদিকে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে উত্তাল ঢাকা শহর এবং অন্যদিকে শ্রেণিঘাতজনিত গ্রামীণ জনপদের বাস্তব চিত্র। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের চাপে গ্রামের মজুর চাষীরা সুদিনের আশায় সংগঠিত হয় আবার বিচ্ছিন্ন হয়। এই সব খণ্ড খণ্ড ছবি উপন্যাসের কাহিনীসূত্রে অঙ্কিত হয়েছে। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ থেকে নদীবুকে জেগে ওঠা প্রত্যন্ত চর থেকে সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে শহরের উত্তাল পরিস্থিতি ও গ্রামীণ সমস্যার সমন্বয়ে এই উপন্যাসের অখণ্ড কাহিনীবৃত্ত নির্মিত হয়েছে।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের সূচনা মকবুল হোসেনের বড়ো ছেলে আবু তালেবের পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার খবরের মধ্য দিয়ে। বহুমুখবৈরীবশে দুই সহযোগিতায় পুলিশ লাশ দিতে অস্বীকৃতি দেয়। ইউনিভার্সিটির ইকনমিক্সের ছাত্র আলাউদ্দিন হোসেন বাবু ও তার একজন সঙ্গী আসে আবু তালেবের লাশটা নিতে আসে জানাজা করানোর জন্য। কিন্তু পুলিশ তাদের সে সুযোগ দেয় না। ক্ষুব্ধ হয়ে তারা এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

'শহীদের রক্ত—বৃথা যেতে দেব না।'

—তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় শহীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ধর্মঘট তারা ব্যর্থ হতে দেবে না। পিকেটিং ঘুরে বেড়ায়, আশেপাশের দোকান খোলা থাকলে খবর দেয়। সমবেত মিছিলে আওয়াজ ওঠে—

'আইয়ুব শাহী, মোনেম শাহী ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক'

—এইসব রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে মানুষের শ্রেণিগত সংগ্রাম ও দোদুল্যমানতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের উপবৃত্তের সমাজ বাস্তবতার ছবিটা অতীব করুণ। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে মূলত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ আর নিপীড়নের দাপটে নিম্ন বৃত্তের মানুষ কিংবা প্রায় বিত্তহীন হাল—লাঙলের উপর নির্ভরশীল কৃষক-মজুর সম্প্রদায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভূ যারা তারা নানা অছিলায় ওই সব মানুষের উপর জুলুম চালিয়ে তাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছিল। বৈরাগী ভিটা এবং তদসংলগ্ন নানা গ্রামে বর্গাদার চাষীদের হালের বলদ, দোয়া গাই রাতের বেলা চুরি হয়ে যাচ্ছিল। সকল গ্রামের চাষীরা জানে গরু চুরি হয়ে কোথায় যায় কিন্তু তারা নিরুপায়। আনোয়ারের বন্ধু জালাল মাস্টার চিঠিতে আনোয়ারকে ব্যাপারটা জানাই। এই অঞ্চলের দোর্দণ্ড প্রতাপ বড়ো জোতের মালিক খয়বার গাজী পরিবারের শত্রু। খুন করতেও সে দ্বিধাবোধ করে না। চেংটু, আনোয়ার, আলিবক্স সম্মিলিতভাবে এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কিন্তু তারা ক্ষমতাবান গাজীদের পেরে ওঠে না; খুন হতে হয় চেংটুকে। মূলত পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ আর নিপীড়নের দাপটে বৃত্তহীন হাল-লাঙলের উপর নির্ভরশীল মানুষের করুণ অবস্থা ও প্রতিবাদের চিত্র উপন্যাসের কাহিনি এই উপবৃত্তে বর্ণিত হয়েছে।

উপন্যাসটিতে লেখক কোন নিটোল কাহিনি বয়ন করতে যান নি। মিটিং, মিছিল ও আন্দোলন নিয়েই উপন্যাসটি গড়ে তোলা হয়েছে। তাই চরিত্রগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা অবদমিত করে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবয়ব নির্মাণে সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সেই দুগমানসকে ধরে রাখার জন্য ওসমান, আনোয়ার, আলাউদ্দিন, খিজির, আলিবক্স জালাল মাস্টার, খয়বার গাজী, চেংটু, রানু,

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হাড্ডি খিজির। সে ছিল ছিন্নমূল মানুষের প্রতিনিধি। তার জন্ম অন্ধকারে ও শোষণের মধ্যে। সে চেয়েছিল শোষণমুক্ত একটি দেশ, যার প্রতিনিধি বা নেতৃত্বে থাকবে তারই মতো লুম্পেন, পিচ্চির দল। এদিকে হাড্ডি খিজিরের মতো পিচ্চিরা আলাউদ্দিনের মতো লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তারা আর পেরে ওঠে না। মধ্যবিত্তরা চায় শুধু ওপরে উঠতে। ফলে মধ্যবিত্তের কাছে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ আশা করা যায় না।

রঞ্জু ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে নিপুণভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। চরিত্রগুলি রূপায়ণে আখ্যানভাগে কীভাবে উনসত্তরের গণআন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানকে তোলপাড় করেছিল তা লেখকের বক্তব্যে স্পষ্ট—

> "১৯৬৯ সন আমাদের দেশে প্রত্যেকের জন্যে এবং সবার জন্যে
> খুব তোলপাড়ের বছর।
> সবধরনের শোষণের বিরুদ্ধে মানুষকে এরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাথা
> তুলতে অনেকদিন
> দ্যাখা যাইনি।...বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ রাস্তায় নামে, ভদ্দরলোক
> নিজেদের ছুঁৎমার্গ,
> নাক উঁচু ভাব ঝেড়ে ফেলার উদ্যোগ নেয় এবং ব্যক্তি পরিণত
> হওয়ার চেষ্টা করে মানুষ।
> আমার লেখায় যাকে বলে সুগ্রহিত তেমন কোনো কাহিনী নেই,
> গল্পো বানাবার ক্ষমতা
> কিংবা প্রবৃত্তি আমার নেই। আবার চরিত্রগুলো যে আমার খুব
> রোজকার চেনা তা নয়,
> কিন্তু তাঁরা কেউই আমার অপরিচিত নয়।"

—লেখকের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে, চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক ও জনজীবনের ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি।

প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন সামাজিক অবস্থানটিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। তাই ঔপন্যাসিক ওসমানকে কেন্দ্রিয় ও প্রতীক চরিত্র করে গড়ে তুলেছেন। কেননা সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে ওসমান ছিল মধ্যবিত্তের সন্তান। তার মনোজগৎ মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতায় পূর্ণ। লেখকের ভাষায়—

> "ওসমানকে আমি আনতে চেয়েছি এমন একজন মধ্যবিত্তের প্রতীক
> হিসেবে যে আসলে মানুষের অগ্রযাত্রায় যোগ দিতে চায়।"

—এখানে 'যোগ দিতে চায়' শব্দত্রয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মধ্যবিত্তের শ্রেণি চরিত্রের ভীরুতা, সাহসিকতা, পরার্থপরতা, আগে চলার ইচ্ছা ও পিছিয়ে যাওয়ার বাঞ্ছা। রহমতউল্লার চিলেকোঠার বাসিন্দা ওসমানের রাজনৈতিক কর্ম-কুশলতা তেমন চোখে পড়ার মতো নয়। সে রাজনৈতিক সচেতন কিন্তু সরাসরি রাজনৈতিক কার্যকলাপে কেমন যেন কুণ্ঠিত। তাই রাজনৈতিক কার্যকলাপ কিংবা মিটিং মিছিলের চেয়ে সে অলীক কল্পনার মত্ততায় মেতে ওঠে। তার চেতনায় দাহ আছে, বিপ্লবের আগুন আছে—কিন্তু প্রয়োগের ব্যপ্তি নেই। আসলে মধ্যবিত্তের ব্যক্তি চরিত্র আত্মনিগ্রহ পরায়ণ চেতনা প্রবল মানুষ গণ আন্দোলনের টানে কীভাবে চিলেকোঠার বিচ্ছিন্ন জগৎ থেকে বের হয়ে আসে ওসমানের মধ্য দিয়ে তাই দেখানো হয়েছে।

উপন্যাসের মূলবৃত্ত ও উপবৃত্তের সমন্বয় সাধন এবং সূত্রধর হিসেবেই আনোয়ার চরিত্র প্রতিষ্ঠিত। আনোয়ার কলেজ শিক্ষক, বামপন্থী রাজনীতির বিশ্লেষক। আনোয়ারের মধ্যেও মধ্যবিত্তের মানসিকতার দোদুল্যমানতা দেখা যায়। বৈরাগী ভিটার অলৌকিক বিশ্বাস প্রসঙ্গে জালাল মাস্টারের গা ঘেঁষে হাঁটে কিংবা করমালী খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে তার ঘরে এলে "খুনের মামলার পলাতক আসামী তার ঘরে।" ইত্যাদি ভাবনার মধ্য দিয়ে তার মানসিকতায় মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। আসলে আনোয়ার মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতা থেকে বার বার বেরিয়ে আসতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। প্রতিবাদ করেছে কিন্তু প্রতিবাদ জোরালো হয়নি। এই প্রসঙ্গে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্য জীবন ও সমকাল গ্রন্থে' করুণারাণী সাহা বলেছেন —

> "আনোয়ারের মানসিকতায় যে চৈতন্যের বিকাশ ঘটেছে তা
> উনসত্তরের প্রগতিশীল
> রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্তের জন্য স্বাভাবিক ও সঙ্গত। আনোয়ার
> ও ওসমানের
> মধ্যে বাঙালী জাতিসত্তার যে উত্তরণ তা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির
> চিত্রায়ণ।"

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হাড্ডি খিজির। সে ছিল ছিন্নমূল মানুষের প্রতিনিধি। তার জন্ম অন্ধকারে ও শোষণের মধ্যে। সে চেয়েছিল শোষণমুক্ত একটি দেশ, যার প্রতিনিধি বা নেতৃত্বে থাকবে তারই মতো লুম্পেন, পিচ্চির দল। এদিকে হাড্ডি খিজিরের মতো পিচ্চিরা আলাউদ্দিনের মতো লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তারা আর পেরে ওঠে না। মধ্যবিত্তরা চায় শুধু ওপরে উঠতে। ফলে মধ্যবিত্তের কাছে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ আশা করা যায় না। এই কারণে লেখক ওসমানকে বারবার হাড্ডি খিজিরের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। খিজিরের মধ্যে লেখক মধ্যবিত্তের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়-ভীরুতা বর্জন করে তাকে আন্দোলনের অগ্রভাগে রেখেছেন। কারণ ইলিয়াস সাহেব মনে করেন হাড্ডি খিজিরের মতো নিম্ন বিত্তরাই বিপ্লবকে সার্থক করে তোলে। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য —

> "স্বায়ত্ত শাসনের সপক্ষ শক্তির সমর্থক ঔপন্যাসিক খিজিরের মতো
> নিঃস্বার্থ
> দেশ প্রেমিক চরিত্র সৃষ্টি করে আন্দোলনের সপক্ষে তাঁর মতবাদকে
> প্রকাশ করেছেন।"

মহাকাব্যধর্মী এই উপন্যাসে লেখক ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতন

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের "চিলেকোঠার সেপাই" উপন্যাসে পটভূমি উনসত্তরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। এই উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ দুটি সমান্তরাল রেখায় বিন্যস্ত হয়েছে। একদিকে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানকালীন উত্তাল ঢাকা শহর এবং অন্যদিকে শ্রেণি সংঘাতজনিত গ্রামীন জনপদ।

ছিলেন। উপন্যাসের কাহিনী স্রোত এগিয়েছে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এর প্লট বিন্যস্ত হয়েছে মূলত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কথন রীতিতে। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের ভাষা ও সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি দিক লক্ষ্য করা যায় —

১। উপভাষা নির্ভর উক্তি বা বক্তব্য।
২। মান্য চলিত নির্ভর বক্তব্য।

—ঢাকা ও বগুড়া অঞ্চলের বাঙ্গালি ও বরেন্দ্র উপভাষা নির্ভর বক্তব্যগুলির আবার দুটি দিক আছে—

১। স্বাভাবিক বচন
২। অশ্লীল বচন

—উপন্যাসের ঘটনা রূপায়িত হয়েছে সহজ, সরল অনাড়ম্বরময় ভাষায়। কোন চরিত্রের মনোভাব যখন তিনি উপস্থাপন করেছেন তখন সেই চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। রহমাতুল্লা ও আলাউদ্দিনের কথা বাঙ্গালি উপভাষা অনুসারী হলেও চেংটু ও করমালীর কথা বরেন্দ্রী উপভাষার অনুসারী। যেমন —

১। খিজিরের সঙ্গে কথোপকথন কালে রহমাতুল্লার ভাষা—

- "অরে অক্ষণ ধরাইয়া দেয় তো কয় বছরের জেল খাটিতে হইব, জানস।"

২। খোয়াড়ে গরু আটবা প্রসঙ্গে চেংটুর উক্তি—

এখন ডাকাত মারা চরত যারা দ্যাখো, ব্যামাক এই অঞ্চলের গরু! গেরস্থের গরু-বাছুর সব আঁটকে আছে।"

—উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে এই ভাষার অসাধারণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

ভাষাগত অশ্লীলতার জন্য কেউ কেউ উপন্যাসটির সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে মহিবুল আজিজ ঔপন্যাসিককে প্রশ্ন করলে ২০/০৭/১৯৮৮ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে ঔপন্যাসিক স্বয়ং জানিয়েছেন —

শোষণের চাপে তাদের ভেতরটা এমনভাবে কুঁকড়ে গেছে যে সেই গ্লানি
বা তিক্তবার কখনো প্রতিরোধ ফুঁসে উঠতে পারে না। বড়ো জোর ক্ষোভে
পরিণত হয়। এই তিক্ততা, ক্ষোভ ও গ্লানি বের করার নালা হল তাদের খিস্তি খেউড়ের চর্চা।

—উপন্যাসে ওসমান থেকে শুরু করে ফালুমিস্ত্রি, খিজির জুম্মানের মা, বজলু ও বজলুর বউয়ের কথায় অশ্লীল ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। আসলে বাঙ্গালি উপভাষার নিম্নবিত্তের মানুষেরা সাধারণত মেজাজ গরম থাকলে খিস্তি দিয়ে কথা বলে। অর্থাৎ বলা যায় উপন্যাসে ব্যবহৃত এই ভাষা স্বাভাবিক।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের "চিলেকোঠার সেপাই" উপন্যাসে পটভূমি উনসত্তরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। এই উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ দুটি সমান্তরাল রেখায় বিন্যস্ত হয়েছে। একদিকে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানকালীন উত্তাল ঢাকা শহর এবং অন্যদিকে শ্রেণি সংঘাতজনিত গ্রামীন জনপদ। এই দুইয়ের সমন্বয়ে, সংকট ও সংঘর্ষে এই উপন্যাসে অখণ্ড জীবনবৃত্ত নির্মিত হয়েছে। তার নিরাবেগ বস্তুজ্ঞান, মধ্যবিত্ত মন ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সমাজ জীবনকে রূপায়িত করেছেন। সমালোচক রফিকউল্লাহ খান "পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের উপন্যাস" প্রবন্ধে যথার্থ বলেছেন —

"বিচূর্ণিত, খণ্ডিত, তমসাচ্ছন্ন সময়ের বৃত্তাবদ্ধতা থেকে মুক্তি প্রত্যাশা ও জাতীয়
অস্তিত্বের সম্পূর্ণতা সন্ধানের শিল্প অভিপ্রায়ে 'চিলেকোঠার সেপাই' নিঃসন্দেহে
স্বাধীনতা উত্তর কালখণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।"

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আখতারুজ্জামানের ইলিয়াসের সাহিত্যে জীবন ও সমকাল
— করুণা রাণী সাহা
২. চিলেকোঠার সেপাই মন ও মননে — ড. মাধুরী বিশ্বাস
৩. চিলেকোঠার সেপাই সার্বিক মূল্যায়ন — ড. বাবলু সাহা

দুটি মন

বিপাশা গোস্বামী (প্রাক্তন ছাত্রী)

'আপনার আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?' 'না, না, আমার চেনা জায়গা এটা। বলছিলাম আমরা তুমি বলে কথা বলতে পারি না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় কি খাবে বল?' সুমনের গলায় আন্তরিকতা।

'কাল-ই মাসিমার মুখে শুনেছি ছেলের আমার মাছ ছাড়া মুখে কিছু রোচে না। ফিশ ফ্রাই-র অর্ডার দি?'

ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে চলে যায়।

'সুমন, তুমি আমায় কিছু বলবে বলে ডেকেছিলে?' হাসি হাসি মুখে জয়িতা বলে।

হুম্‌! জয়িতা লক্ষ্য করে নিমেষেই সুমনের মুখটা ম্লান হয়ে যায়। তবু ও সরাসরি বলে, জয়িতা আমি রোসি ডিসুজা বলে একটি মেয়েকে ভালোবাসি। ও আমার অফিসেই জব করে, ও বিধবা। ওর তিন বছরের একটা ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে আছে। আমার মা-বাবা সব-ই জানে। তবু উনারা তোমার সাথে আমার বিয়ে দিতে চান যাতে তোমার মত সুন্দর বউ পেয়ে আমি রোসিকে ভুলে যাই। কিন্তু এতে তো তোমায় জীবণভাবে ঠকানো হবে জয়িতা? আমি তো ঠগ-জোচ্চর নই। এতকিছু জানার পরও কি তুমি আমায় বিয়ে করবে? কথাগুলো বলে সুমন সরাসরি জয়িতার দিকে তাকায়।

এতক্ষণে জয়িতা নিজেকে প্রাণপণে সংযত রাখার চেষ্টা করছিল। কী বলবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে ওকে কোনদিন-ও পড়তে হয়নি। তবু ও বলার চেষ্টা করে, 'এসব কথা তো ফোনেই বলতে পারতেন। কেন ছোটালেন এতদূর? একটু ঢোক চেপে আবার বলে না, না, বিয়ে করার প্রশ্ন-ই নেই। আপনারা বিয়ে করুন দুজনে। আসি।'

'একি তুমি যে কিছুই খেলে না!'

'পরে, কখনও।' ঘাড় বেঁকিয়ে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বেরিয়ে পড়ে জয়িতা।

থমথমে মুখে বাড়ি ঢোকে জয়িতা। বাথরুমে যায়। চশমাটা খুলে রাখে সেলফে। বেসিনের কলটা খুলে জল দেয় চোখে মুখে। হ্যাঙারে টাঙানো তোয়ালেটা নিয়ে মুখটা চেপে চেপে মোছে। চশমাটা পরে নিয়ে বেরোয়।

'দিদি, কী হয়েছে? তোকে এমন লাগছে কেন?' তুলি জানতে চায়।

কফি হাউসে যাওয়া থেকে ফেরা অবধি সব বলে যায় জয়িতা। বলে, 'মেজো পিসিমণির কথাই ঠিক অতিবড় সুন্দরীর না জোটে বর।'

তুলি অদ্ভুতভাবে তাকায় দিদির দিকে। জয়িতা বলে, 'শোন তুলি আমি আর বিয়ে করব না, একা থাকতে চাই। একা একা কি মানুষ বাঁচে না বল তো? তুই প্লিজ সবাইকে বলে দিস।'

তিন বছর পর —

বড়দিনের ছুটি পড়ে গেছে। সারা বাড়ি হৈ চৈ। ঠিক হয়েছে সবাই মিলে দীঘা যাওয়া হবে। তুলি এম.এস.সি.-তে দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে। ওরই প্ল্যান দীঘা যাওয়া। নানান দিকের চাপে জয়িতা এখন আগের থেকে অনেকটাই শান্ত, পরিণত। গত বছর হঠাৎ-ই বাবা চলে গেলেন। বিয়েটাও আর করা হয়ে উঠেনি। তবু মাঝে সুমনের মায়াবী মুখ, ওর হাসি জয়িতার মনে পড়ে। যদিও সুমনের দাঁতগুলো সুন্দর ছিল না।

সমুদ্রের পাড়ে একটা বোল্ডারে অনেকক্ষণ বসেছিল জয়িতা। ঝোড়ো হাওয়ায় চুলগুলো এলোমেলো হচ্ছিল বারবার। কার্ডিগানের উপর চাদরটা ও আরও একটু ভাল করে জড়িয়ে নেয়। ভাবে এতদিনে নিশ্চয় সুমনের বিয়ে হয়ে গেছে। রোসিকে নিয়ে খুব সুখে আছে। ওর-ও পঁয়ত্রিশ পেরোল। জীবনের কোন এক অজ্ঞাত কারণে ও প্রেম-ভালোবাসা-দাম্পত্য জীবন থেকে বঞ্চিত হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক চিরে বেরিয়ে আসে।

'ম্যাডাম, ও ম্যাডাম! আমায় চিনতে পারছেন?' কি আশ্চর্য, সুমন একেবারে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়ায় জয়িতা। সুমন বলেই চলে, 'আরে কফিহাউসে সেদিন, আরে আমায় চিনতে পারছেন না? যদিও আপনার নামটা ভুলে গেছি।'

'জয়িতা সান্যাল। ভাল আছেন আপনি?' হ্যাঁ ওই আর কি! একাই এসেছেন নাকি?' সুমন জিজ্ঞেস না করে পারে না।

'না, না। মা, কাকু, কাকীমা, তুলি। বাবা মারা গেছেন গত বছর।'

'কিন্তু সুমন, আপনি একা কেন? বিয়ের পর কিন্তু একা আসা ঠিক নয়।'

'বিয়ে মানে? আমি আবার কবে বিয়ে করলাম জয়িতা?' 'এতদিনেও রোসি ম্যাডামকে বিয়ে করেন নি? ভালোবাসলে এতদিন ফেলে রাখা ঠিক নয় কিন্তু।' জয়িতা না বলে পারে না।

'কে বলেছে, আমি রোসিকে বিয়ে করতে চাইনি? ওই তো গোয়া ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগের দিন আমায় জানিয়েছে, আর বলেছে, আমি যেন আমার কাস্টের মেয়ে বিয়ে করে সুখী হই।' সুমনের মুখটা দুঃখী দুঃখী হয়ে যায়।

'এখানে বুঝি বন্ধুদের সাথে এসেছেন?' জয়িতা প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করে।

'হুম, অফিস কলিগ সব।' সুমন ও খানিকটা স্বাভাবিক 'জয়িতা তুমি কেন বিয়ে করোনি?' আপনিটা হঠাৎই তুমি হয়ে যায়।

'মনের মত কাউকে পেলাম না যে। মনের মিল না হলে তাকে বিয়ে করা যায় বলুন? আর বয়সও হয়ে গেল তো, আর ইচ্ছে হয় না।'

'জয়িতা দ্যাখো অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এই জায়গাটা ঠিক সেফ নয়। তোমরা কোথায় উঠেছ?'

'এই তো ডানদিক দিয়ে খানিকটা হাঁটলেই 'প্যারাডাইস গেস্ট হাউস' ওখানে উঠেছি আমরা, জয়িতা বলে।

'চলো, তোমায় খানিকটা এগিয়ে দি।'

'না, না সুমন, আমি যেতে পারব তো। কোন অসুবিধা হবে না। এই তো মিনিট পাঁচেকের পথ।'

'জানি পারবে। তবু চলো-ই না। ধরে নাও না সেদিনের খারাপ ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা থেকে আজ তোমার সাথে একটুক্ষণ থাকতে চাইছি।' সুমন মন থেকে বলে।

'বেশ চলো, ওই যে, ওই দিকে।' জয়িতা সুমনকে পথ চেনায়। আর আরও একবার ঝোড়ো হাওয়া এসে জাপিয়ে দেয় জয়িতা-সুমনদের।

বাংলা—আমার বাংলা

পাভেল আখতার (প্রাক্তন ছাত্র)

বাংলা। শুধু একটি শব্দ। নয়। চেতনা। চিহ্ন। যেন নদীর গভীরের সুর স্পর্শ লেগে আছে যার গায়। [illegible] জোনাকের স্মৃতি। এই শব্দ যেন গান, স্মৃতি-প্রীতি-সত্তার নিবিড় সমাহার। আড়ংঘাটের বাঙালি-জীবনের ইতিহাস-ভূগোল, সাহিত্য-সংস্কৃতি অর্থনীতিময়। সার্থক বাংলা।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যকে 'বাংলা' নামে চিহ্নিত করার সরকারি সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছেন। [illegible]। এর পেছনে নিশ্চয় কারণও অনেক রয়েছে। [illegible] 'বাংলা আমার [illegible] নীতি'-র [illegible] যে সক্রিয়তা লক্ষ করা গিয়েছিল তার উদ্দেশ্য না বলি ছিল, বাংলা আমার [illegible] করা এবং 'পশ্চিমবঙ্গ' বা 'WEST BENGAL', ও 'কলকাতা', 'কলিকাতা' বা 'CALCUTTA' ইত্যাদি নাম পরিবর্তন করে বাংলা ও ইংরেজিতে একটি অভিন্ন নামকরণ করা হোক—যথা: রাজ্যের নাম হোক শুধুই 'বাংলা' এবং শুধুই 'কলকাতা'। [illegible] যদি 'চেন্নাই' হতে পারে, [illegible] 'মুম্বাই' করা যায় তবে 'পশ্চিমবঙ্গ'-কে 'বাংলা' বলতে অসুবিধা কোথায়—এই ছিল প্রধান যুক্তি।

আমার মনে হয়, এই কারণে বরং এখান থেকেই প্রথম শুরু করা উচিত ছিল। 'What Bengal thinks today India thinks tomorrow' —এই প্রবাদটির তাহলে প্রমাণ হোত। আশ্চর্য! প্রসঙ্গত 'বাংলা'-র অস্তিত্ব, [illegible]। 'পশ্চিম'—এই যোগবাচক শব্দটি তাহলে কি? সে প্রশ্নের উত্তর কোথায়? [illegible] আছে বিচ্ছেদের বেদনা। এক ও অভিন্ন বাংলা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে দু-টুকরো হয়—পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। [illegible] পূর্ববঙ্গ হয় [illegible] 'বাংলাদেশ'। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রয়ে গেল [illegible]। [illegible] পূর্ব নেই, অতএব পশ্চিমও থাকবে না তা নয়। [illegible] (উ. দ. পূ. প.) [illegible]। [illegible] 'আমার সোনার বাংলা / আমি তোমায় ভালোবাসি'—এখানে [illegible]।

'বাংলা' শব্দোচ্চারণের সাথে সাথে একটি বৃহৎ ধারণা, ভাবনা, একটি বিপুল প্রেক্ষাপট চিত্রিত হয় মনের ক্যানভাসে।

সবুজ কোনও কবির কলমে এ কাঠখোট্টা 'পশ্চিমবঙ্গ' লিখিত হয়নি কখনো, হয়েছে শুধুই 'বাংলা'। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'—লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। বাংলার কলকুঞ্জে এই কবি আবার ফিরে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন 'জলাঙ্গীর ঢেউ-এর ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়' যেখানে 'সুদর্শন উড়ে সন্ধ্যার বাতাসে', [illegible] শিশু এক উঠোনের ঘাসে'। সুতরাং কোথায় 'পশ্চিমবঙ্গ'! [illegible] শব্দটা। অথচ বাঙালী মাত্রেই আবেগ, কল্পনা আর সৃষ্টির এক বিচিত্র রমণীয় ভুবন। এ ভুবনে কালজয়ী সব অমূল্যরত্নের সমাহার। চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাসের এ বাংলা, ভারতচন্দ্র-মধুসূদনের এ বাংলা, বঙ্কিম-শরৎ-বিভূতিভূষণ-কমলকুমারের এ বাংলা, নজরুল-ঋত্বিকের এ বাংলা। তাহলে কি আমার আপনার নয় এ বাংলা? অবশ্যই। সদ্যোজাত শিশু থেকে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ সবার এ সোনার বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ কারোর নয়। আমাদের মেধা ও মননে, অনুভব ও বচনে এই একটিমাত্র শব্দের ঝংকার—বাংলা। চেতনার সমগ্রতায় শুধু এই একটি শব্দেরই খোলা হাওয়া—বাংলা। আমরা বাস করি বাংলাতেই—একদিন চোখে ঠুলি পরেছিলাম—এখন উন্মুক্ত নেত্রে দেখি চারিদিকে শুধু বাংলা আর বাংলা। 'পশ্চিমকে পশ্চিমেই দাও নির্বাসন। মন চলো নিজ নিকেতনে'। স্বাগতম—বাংলা।

কে এর বিরোধিতা করল তাতে কিছু যায় আসে না। ওসব ফুৎকারে উড়ে যাবে। বাংলা বাংলাতেই থাকবে। তবে একটা রাজ্যের নাম পরিবর্তনেই (যদিও এটাকে আমি পরিবর্তন বলতে নারাজ, বরং আসল নামে ফিরে আসা বলতে চাই) আমাদের সব সক্রিয়তার অবসান অনভিপ্রেত। আমরা ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত ভাষায় আর কথা বলব না। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলা সঙ্গীত আমাদের দৃষ্টি সৃষ্টি করুক, হৃদয় ও সত্তার নবনির্মাণ সম্পন্ন করুক। কবি মধুসূদন একদিন খ্যাতি ও কীর্তির ভুল পথকে পশ্চাতে রেখে ফিরে এসেছিলেন নিজের বৃত্তে, স্বনীড়ে। এই ফিরে আসায় কোনও লজ্জা নেই, আছে মহত্ত্ব। প্রত্যাবর্তন উত্তরণের সূচক। শুরু হোক তাই নীড়ে ফেরা—বাংলার ভুবনে। আবেগ-কল্পনা-মনন—সব এসে মিশে যাক একটি বিন্দুতে। বাংলার সিন্ধুতে।

এই বৃহৎ জলরাশি—বাংলার ভুবনে একাকী ঊর্মি বিস্ময়ে। নাহি অবসান তার। অবসান সে হওয়ার নয়।

স্মৃতি বিজড়িত ডি. এন. কলেজ

আনোয়ার হোসেন সিদ্দিকী (প্রাক্তন ছাত্র)

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কে.এন.কলেজ, জিয়াগঞ্জ কলেজ, জঙ্গিপুর কলেজ ও বান্দি রাজ কলেজের পর গড়ে ওঠে এই ডি.এন কলেজ, অরঙ্গাবাদ। ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের সময়ে স্মৃতিপটে ভাসে এই কলেজের পুরনো দিনের কথা। এই পরিপ্রেক্ষিতে লিখতে বসে স্মৃতিচারণ করি অধ্যক্ষ বিজনবাবুকে, আমি যখন পড়াশুনা করি তখন অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীকুমার আচার্য মহাশয়। এই কলেজের প্রগতির পাথে যাঁদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁরা হলেন লুৎফল হক সাহেব প্রাক্তন এম.পি ও এম.এল.এ। আর একজন নিলীপ কুমার দাস (কোম্পানি) মহাশয়। এই দুইজনের এবং এলাকার শিক্ষাবিদ ও বিড়ি শ্রমিকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে এই কলেজ।

আমার এই কলেজ জীবন আনন্দ থেকে বেদনায় রেখাপাত করেছে। যে সময়ে পড়াশুনা করেছি সেই সময়ে মস্তানির প্রবণতা খুব বেশি ছিল। ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্সের পরীক্ষার্থী ছিলাম ১২ জন। স্যারেরা হোম সেন্টার ডি.এন.কলেজে পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীদের টোকা-টুকির সুযোগ না দেওয়ায় তারা অনার্স প্রথম পত্র পরীক্ষার দিন নাম লিখে খাতা জমা দেয় আর আমি খাতা নিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে অধ্যক্ষ মহাশয় এর ঘরে চলে গিয়ে পরীক্ষা শেষ করি এবং বাড়ি যাই। তারপর রাষ্ট্রবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার দিন দুজন সঙ্গী নিয়ে কলেজে ঢুকি। কলেজে কোন পুলিশ ছিল না। লাইব্রেরীয়ান সন্তোষবাবুকে উপেক্ষা করে কিছু দুষ্কৃতি আমাকে টেনে কলেজ থেকে বাইরে নিয়ে যায় এবং বাগানের পাশ দিয়ে এক বর্ধিষ্ণু বাড়িতে লুকিয়ে রাখে। দুপুর ১২টায় পরীক্ষা ছিল। ১টার দিকে পুলিশ বাহিনী অনুসন্ধান করতে করতে সেই বাড়িটা ঘিরে ফেলে এবং পুলিশবাহিনী আমাকে সঙ্গে নিয়ে কলেজে আসে। ডাক্তার অশোকবাবু আমাকে চিকিৎসা করেন এবং অধ্যক্ষ (Principal) শ্রী কুমার আচার্য মহাশয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সত্যেন সেন মহাশয়কে ফোন করে সম্মতি নিয়ে বিকেল ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষার শেষে অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য মহাশয়ের বাড়িতে চলে যাই এবং অনার্সের বাকি তৃতীয় ও চতুর্থ পরীক্ষা পুলিশের সহায়তায় দিয়ে থাকি। অতুলনীয় স্যার শ্রীকুমার বাবু পরীক্ষা শেষে দুজন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সঙ্গে নিমতিতা পাঠান। সেখানে পিতা আফসার আলি সিদ্দিকী সাহেবের হাতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আমাকে তুলে দেন। কেস হয়ে গিয়েছিল। কিছু লোক যখন বাবার কাছে গিয়ে কেস তোলার জন্য সুপারিশ করেন, বাবা বললেন, 'সবাই আমার ছেলের মতো'। তারপর কেস তুলে নিলাম। এই ব্যাপারে 'শ্রীকুমার স্মরণে' পত্রিকায় অধ্যাপক ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বাবু কিছু কথা লেখেন এবং টিচার্স কাউন্সিলের ১৮.৯.১৯৭৪ তারিখের রেজেলিউশনে এটা উল্লেখ আছে। স্মৃতিচারণ করি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্যার শ্যামসুন্দর বাবু; ডঃ মুজিবর রহমান বাবু, শেখরবাবু ও তরুণ বাবুকে এবং অন্যান্যদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল। তখন লিখেছিলাম —

জীবনের পাতায় পাতায়
লেখা আছে একটি খাতায়
বেদনার টিপি
মুছিবে কি না জানিনা
সেই লিপি।

আজ কলেজ জীবন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, শিক্ষকতার জীবন অতিবাহিত করে অবসর জীবনে পদার্পণ করেছি। এই কলেজ অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে আমার কাছে। শিক্ষার অগ্রগতিতে এই কলেজ অপ্রতিরোধ্য হয়ে আছে আজও।

শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্টান এই মহাবিদ্যালয়, শিক্ষার অঙ্গনে প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করুক আমার এই প্রাণের ডি.এন.কলেজ অরঙ্গাবাদ, যার ফোকাশে শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থিনী আলোকিত হয়ে দেশ ও মানব কল্যাণে নিয়োজিত হোক, আশাবাদী আমি।

Teacher's Council

Dukhulal Nibaranchandra College
P.O. : Aurangabad, Murshidabad (W.B.)

True Copy of the resolution adopted in the meeting
of the Teaching's held on 18-9-74

In view of the disturbances created by the students and the examinees and specially due to physical assault on and kidnapping of one of the examinees, namely Anowar Hossain Siddiqui bearing Roll No. Aurang H6/74, willing to take part in the B.A. Part - I Hons. Examination on 18-9-74 within the college premises, the teacher's council of the college unanimously resolves in the following way :

1) that the B.A. Part I Pass Examination 1974 and the subsequent University examination be taken under the direct supervision of the Calcutta failing which necessary arrangements be made fro holding the said examination elsewhere other than this centre.

2) that the Principal be requested to take necessary legal help from the administration against those involved in ransacking the examination and assaulting and kidnapping the said examinee willing to take part in the said examination.

3) that necessary disciplinary action to the extent of expulsion from the college be taken against the existing students involved directly in this evcil fame.

4) that Anwar Hossain Siddiqui bearing Roll Aureng No H 6.74, be heartly congratulated for his honesty, sincerity and intensity of character to brave the ugly situation fro appearing at the said examination in the face of dire consequences.

Principal & President Sk Acharaya 18/9/74

ডি.এন.সি. কলেজ সংগঠকদের প্রণাম

মহ: মোজাম্মেল হক
(প্রিন্সিপ্যাল -লুথার ইনস্টিটিউশন)

ইতিহাস ইতিহাসই। ইতিহাস গড়তে রচতে হয়। গড়লে-রচলে-করলে তবেই ইতিহাস।

গড়তে গিয়ে লড়তে-পড়তে, হাঁসতে-কাঁদতে মালা গেথে সব সইতে হয়, তবেই ইতিহাস গড়া হয়।

যেমন মমতাজের স্মৃতিসৌধ গড়েছেন সম্রাট শাহজাহান। আজও মাথা উঁচু করে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের স্থানে অবস্থান করছে তাজমহল।

শাহ্জাহান বাদশা ছিলেন। মোগল বাদশা। কবির কটা লাইন —

তাজমহলের পাথর দেখেছো,
দেখেছো কি তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী
বাহিরে শাহজাহান।

২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছরে অসীম ধৈর্য্য ধরে কঠিন কর্মকার, গড়েছেন তাজমহল। এটা এক বিস্ময়। এটাই ইতিহাস। তাজমহল আগ্রা তথা ভারতের গৌরব।

ডি.এন.সি. কলেজ অরাঙ্গাবাদ তথা জঙ্গীপুর সাবডিভিশনের গৌরব। আগামীতে কত কি হবে তা সময়ই বলবে। তবে এই কলেজ গড়ার যারা নির্ভীক নিস্বার্থ সৈনিক, তাঁদের কথা আমরা আজও অনেকে জানি, অনেকে জানিনা। যাঁরা এই কলেজ গড়েছেন তাঁরা কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের মত সম্রাট বা বাদশা ছিলেন না। তাঁরা কিন্তু তাদের নিজস্ব সন্তান সন্ততিদের লেখা-পড়ার কথা ভেবেই এটা গড়েননি। এলাকাবাসীর ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার জন্যই লড়েছেন গড়েছেন, সফলতা পেয়েছেন। এ সফলতা একদিনে, এক মাসে এক বছরে আসেনি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও কয়েক বছর ধরে লড়াইয়ের পর পেয়েছেন, এই ডি.এন.সি. কলেজ। উল্লেখযোগ্য হল, খেটে খাওয়া, দিন আনে দিন খায়, নুন আনতে পান্তা ফুরায় যাদের, সেই জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিকদের তিল তিল করে দান করা পয়সায় গড়া কলেজ আজ পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। শয়ে, শয়ে, হাজারে হাজারে ছাত্র-ছাত্রী আজ এই কলেজে লেখাপড়া করে উচ্চ শিক্ষালাভ করছে, স্মরণীয় সেটাই। তিল তিল করে তাল করা, রাই কুড়িয়ে বেল করা মোটেই সহজ কাজ নয়। শ্রমিকরা যা পেরেছেন পয়সা দিয়েছেন, সঙ্গ দিয়েছেন। আন্দোলনে উৎসাহ যুগিয়েছেন, এ মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়। এ অসাধ্য সাধন। কারণ তারা দিন মজুর। দিন আনে তারা দিন খান। সম্রাট শাহ্জাহানের রাজস্ব অগাধ ধনসম্পত্তি থেকে খরচ করে তাজমহল গড়া, আর বিড়ি শ্রমিকদের দিন মজুরি থেকে পয়সা দান করে এই কলেজ গড়া আসমান জমিন ফারাক। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে এ যে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার সামিল। তবে কর্ণধার এম.পি.হক সাহেবের কঠিন নেতৃত্বদান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সফল। মাষ্টার আবুল হোসেন, মাষ্টার বেলাল হোসেন,

মোজাম্মেল হক, ইদ্রিশ আলি প্রমুখ বিদোৎসাহী, বিদ্যানুরাগী, সমাজদরদীদের প্রেরণায়ও কলেজ গড়ে উঠেছে। এ কিন্তু কম আশ্চর্যের নয়। আজকের মোস্তাক হোসেন সাহেব পতাকা বিড়ি, জাকির হোসেন সাহেব, শিব বিড়ির মালিকরা যদি তখন এমন আর্থিক সমৃদ্ধ থাকতেন তবে ১৯৬৫ সালেই অরঙ্গাবাদবাসী কলেজ গড়তে পারতেন। কারণ মোস্তাক সাহেব, জাকির সাহেব আজকের দিনে শিক্ষা প্রসারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দানের হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। তখন থাকলে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতেন। যাই হোক দাস কোম্পানী অর্থাৎ এম.বি.এম কোম্পানীর কর্ণধার দিলীপ দাস মহাশয়ের দানের টাকা না পেলে হয়ত এই কলেজ গড়া সম্ভব হোত না। বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন দলের সমর্থন, লুৎফল হক এম.পি. সাহেবের মজবুত নেতৃত্বে এবং দাস কোম্পানির দিলীপ দাস মহাশয়ের বিশাল আর্থিক সহায়তায় এই ডি. এন কলেজ শিক্ষামিলন মন্দির গড়ে উঠেছে।

আর ও উল্লেখ্য মন্দির, মসজিদে, চার্চ, প্যাগোডা গড়ি আমরা ধর্মীয় উপাসনাগার হিসেবে।

মন্দিরে হিন্দুরা, মসজিদ মুসলিমরা, চার্চে খ্রিস্টানরা আর প্যাগোডায় এক মাত্র বৌদ্ধরাই যান।

পরিষ্কার করে দিলে দাঁড়ায়, মন্দিরে একমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন যায় পূজার্চনাদি করার জন্য। মসজিদে একমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন যায় তাদের ধর্মীয় নামাজ আদায় করার জন্য। চার্চে একমাত্র খ্রিস্টান লোকজন যায় তাদের যিশু খ্রিস্টের ধর্মোপদেশ প্রদান ও গ্রহণের জন্য।

কিন্তু শাহ্জাহানের তাজমহল লক্ষ লক্ষ পর্যটকের দর্শনীয় স্থান। আর এই তাজমহল লক্ষ লক্ষ মানুষকে শুধু দর্শনের আনন্দ দান করছে।

কিন্তু এই অরঙ্গাবাদ ডি.এন.সি. কলেজ হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর, ধনী, গরীব, শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল পরিবারের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা দান করে চলেছে। এখানে কোন প্রকার জাতিভেদের জায়গাই নেই। যে কোন জাতির ছাত্রছাত্রী হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান এক সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করছে। এদিক থেকে বলতে গেলে মন্দির, মসজিদ, চার্চ, প্যাগোডা থেকে ও এই কলেজ পবিত্র স্থান। সকলের স্থান।

তাই এই ডি.এন.সি. কলেজ বিদ্যামন্দির তাজমহল, বা মন্দির, মসজিদ, চার্চ প্যাগোডার চেয়েও অনেক মূল্যবান ও দরকারী। কারণ বিদ্যামন্দির সকলের মন্দির। শিক্ষাদানের মন্দির, মানুষ গড়ার তীর্থস্থান।

তাই আমরাও গাইতে পারি।
ডি.এন.সি. কলেজের
বাহির দেখেছো
দেখেছো কি তার তল?
এ কলেজ নির্মাণে, এম.পি লুৎফল হক,
দিলীপ দাস ও বিড়ি শ্রমিকের দল।
শিক্ষাগ্রহণে উপকৃত কিন্তু
আজ অজস্র ছাত্রছাত্রীর দল।।

এই সুন্দর ডি.এন.সি. কলেজ মন্দির যারা তৈরি করেছেন তাঁরা মানব নন মহামানব। কারণ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড অনেকে বললেও আমি বলি শিক্ষা মানুষের মেরুদণ্ড। শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, আর বিপ্লব আনে মুক্তি। অরাঙ্গাবাদ কলেজের যারা প্রথম উদ্যোক্তা তারা অরঙ্গাবাদকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোয় মুক্তিদানের অগ্রদূত।

আসুন আজ এই কলেজের সবুর্ণজয়ন্তীতে আমরা তাদের সকলকে জানাই আমাদের প্রাণভরা প্রণাম, সালাম, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

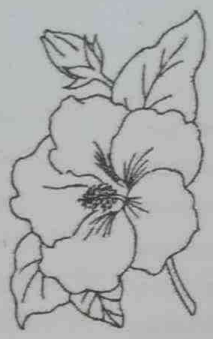

সূর্যের মতো দীপ্তিমান হতে হলে
প্রথমে তোমাকে সূর্যের মতোই পুড়তে হবে।

—ড. এ. পি. জে. আবদুল কালাম

সুস্থ সমাজ গঠনে ছাত্র ও যুব সমাজের ভূমিকা

বানী ইসরাইল (প্রাক্তন ছাত্র)

ভূমিকা :

আজকে যে ছাত্র, আগামীদিনে সে দেশের নাগরিক। আজকে যে অঙ্কুরিত বীজ কালকে সে মহীবৃক্ষ হয়ে প্রদান করবে ছায়া, ভরসা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিকরণের সবলধারা। পথ তার আপন গতিতে চলে যায়, সময়ের ছন্দটাও অনুরূপ। জোয়ার ভাটার মতো উত্থান-পতনের জীবন ধারাই আজকের ছাত্র ও যুব সমাজের দশা সমরূপ নানান হানি, নানান কলুষতার করাল গ্রাস ছাত্র ও যুব সমাজকে বিনষ্ট করার আয়োজন করছে। তখন আমরা শপথ নিতে যাচ্ছি সকল ব্যাধি থেকে ছাত্র সমাজকে উত্তীর্ণ করতে হবে আলোকবর্তিকার এক মহান শান প্রদীপের তলে। কেননা ছাত্র সমাজই পারে সুস্থ সমাজ গঠনের ভূমিকা নিতে। তাই কবি কণ্ঠে উদাত্ত ভঙ্গীমায় জেগে ওঠে—

'আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল'।।

শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গঠন :

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। যে সমাজে শিক্ষা নেই, সেই সমাজ উন্নত হতে পারে না। তাই সমাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে ছাত্র ও যুবসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কেননা শিক্ষাই পারে একমাত্র সমাজকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে। তাই প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম বলেছেন—আজকের ছাত্র ও যুব সমাজ আগামীর ভবিষ্যত। ছাত্র ও যুবকরা সুস্থ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা ছাত্রাবস্থায় যে বীজ রোপণ করা হয় তা পরবর্তীতে সুস্থ সমাজ গঠনের ফল পাওয়া যায়।

সম্প্রীতি রক্ষার্থে যুব সমাজ :

সম্প্রীতি শব্দটি আজ আমাদের মধ্যে ধোঁয়াশা হয়ে উঠেছে। ক্রমশ, অবশেষ সব যেন ধীরে ধীরে শব্দ ঘুরে মরে যাচ্ছে। নিঃশব্দ বলতে এখন আমাদের ছুরি, কাস্তে, বুলেট, বোমা যার আস্ফালনে টলমল করছে আমাদের সংহতির দুনিয়াও। আমরা কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন ভুলতে বসেছি—

'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ? সন্তান মোর মা'র'।

তাই ভারতবর্ষ নানা ভাষা, নানা মতের দেশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। কিন্তু আজ নানা কারণে আমাদের সুস্থ সমাজের মধ্যে কিছু বেনোজল ঢুকে পড়েছে। যে সমাজ পূর্বে সবুজের সমারোহে ফুলে ফলে ভরা ছিল, আজ তা বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যা ঘটে চলেছে তাতে গোটা সমাজ আতঙ্কিত। এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে একমাত্র মুক্তির পথ ছাত্র ও যুবসমাজই দিতে পারে। আবারও কবি সুকান্তের ভাষায় বলতে পারি —

'এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'।

তাই এই অরাজকতার গণ্ডি থেকে একমাত্র বাঁচার পথ সমস্ত ছাত্র ও যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যখনই সমাজে কোনো স্বাধীনতার দরকার, কোনো বিপ্লবের দরকার, তখনই বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে ছাত্র ও যুব সমাজ। যারা সমাজের কোনো বাধা বিপত্তির পরোয়া করে না। এদের রয়েছে সমাজকে সুস্থতার পথে নিয়ে যাওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত যেমন সভা সমিতি, মিছিল ইত্যাদি।

আদর্শ নেতৃত্বের দ্বারা সুস্থ সমাজ গঠন :

দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী হিসেবে ছাত্র ও যুব সমাজই একটি দেশকে সুস্থ সমাজের দিকে চালিত করতে পারে বলে আমি মনে করি। কেননা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় আদর্শ নেতৃত্বের। এর ফলে একটি জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

সম্ভব বলে আমি মনে করি। তাই দেশকে প্রত্যাশিত সুস্থ সমাজ গড়তে প্রয়োজন মূল্যবোধের ভিত্তিতে আগামী প্রজন্মকে গঠন করা যাদের হাতে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে। ছাত্র ও যুব সমাজ সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র ও যুব সমাজ হল একটি জ্ঞান ভিত্তিক সংগঠন আবার, এ সংগঠনের সুনামকে নষ্ট করতে স্বার্থান্বেষী নেতা-কর্মীদের যেমন জুলুম-নির্যাতন করছে, তেমনি তথ্য প্রযুক্তি ও দলীয় মিডিয়া ব্যবহার করে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা সফল করতে দিবে না এই ছাত্র ও যুব সমাজ। কিন্তু এই ছাত্র ও যুবসমাজ শত বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করে দেশ রক্ষার জন্য নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে যোগ্য হিসেবে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধে যুব সমাজ :

বর্তমান পরিস্থিতিতে যুবশক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য ভারত তথা সমাজ বিরোধী কতগুলি আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তি যথেষ্ট তৎপর হয়ে উঠেছে। ওই সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মৌলবাদী শক্তি বর্তমান যুব সমাজের মধ্যে সংকীর্ণ চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ও যুবশক্তিকে মাদকাসক্ত করে কট্টরপন্থী মৌলবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করে দেশের উন্নয়নের ঐক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে পড়েছে। সুতরাং যুবসমাজকে তৎপর থাকতে হবে যেন তারা সকল প্রকার রাষ্ট্র বিরোধী দানবীয় শক্তির মোকাবিলা করতে পারে। তাহলে সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে। এর ফলে দেশের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে সুস্থ সমাজ গঠন করা যাবে।

বিবেকানন্দের মতে সুস্থ সমাজ :

'জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।—

বিবেকানন্দ যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'দেশ প্রেমিক হও'—জাতিকে প্রাণের সঙ্গে ভালোবাস। আবার তাঁর যুবকদের প্রতি আশীর্বাদ ছিল—'এ জীবন কেবল ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নয়। দেশের মানুষের জন্য'। উপরোক্ত উক্তি থেকে জানতে পারি যে যুবকদের তিনি দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। যুবসমাজের যুদ্ধ অশিক্ষা ও অশাস্ত্রের বিরুদ্ধে। তাঁর আশা ছিল ছাত্র ও যুবকরাই ভারতকে পূর্ণ মহিমা ফিরিয়ে দিতে পারবে। তাই আবার ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে পড়ে যায় এই সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্যে তফাৎ কী? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন—"অতীতে পাঁচ হাজার বছর ভারতবর্ষ যা কিছু ভেবেছে, তারই মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ, আর আগামী দেড় হাজার বছর ভারতবর্ষ যা কিছু ভাববে তারই অগ্রিম প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। তাই আমি মনে করি, ছাত্র ও যুবসমাজ সব সময় বিবেকানন্দের পথ যদি অনুসরণ করতে পারে, তাহলে সুস্থ সমাজ গঠন করা যাবে।

দেশ গঠনে যুব সমাজ :

বর্তমান ভারতের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হল যুবশক্তি। সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে যেমন দাঁড়িয়ে থাকে বিশাল তোরণ সেরূপ বর্তমান দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্তমান India a Developing India যুবশক্তির দক্ষতা, জ্ঞান ও যুবশক্তির আন্তর প্রেরণার উপর। তাই বর্তমান ভারত চরম আশাবাদী যে আমাদের দেশ বর্তমান শতাব্দীদে এক উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সফল হবে। কেননা, পরবর্তীতে আমাদের এই যুবসমাজের অগ্রণী ভূমিকার জন্য ভারতবর্ষ বিশ্বের কাছে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

জন সচেনতনতামূলক কাজ :

আজ বর্তমান সমাজে যে কোনো অলিতে গলিতে সচেতনতার অভাব দেখা যাচ্ছে। তাই জনসচেতনতামূলক কাজ যেমন মাদকাশক্তি দূরীকরণ, মেয়ে বাঁচাও মেয়ে পড়াও, কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া অসহায় সমাজের মহিলাদের শিক্ষিত করা। বর্তমান কেন্দ্র সরকারের Skill India, Digital India ও Make In India ইত্যাদি নানাভাবে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করছে বলে সমাজে সুস্থতা ফিরে আসবে।

শিষ্টাচারের মধ্য দিয়ে সুস্থ সমাজ :

সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে হলে ছাত্র ও যুবসমাজের সুপরিকল্পিত শিক্ষা এবং তা প্রয়োগের জন্য সুস্থ মানসিকতার প্রয়োজন হয়। আর এই মানসিকতা গড়ে তুলবে শিক্ষার কারিগর শিক্ষক-শিক্ষিকা মহল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে সুভাষচন্দ্র শিক্ষাগুরু বেণীমাধব দাসের কথা। কেননা তাঁর সান্নিধ্যে এসে দেশ গঠনে ও সুস্থ সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুপ্রেরণা হয়ে গুরুর অন্তরের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নেয়। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসু দেশকে সুস্থ সমাজ হিসেবে দেখার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

মূল্যায়ণ :

পরিশেষে বলা যায় যে, মানবজীবনে ছাত্র ও যুবসমাজের ভূমিকা হল গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিসীম। কারণ ছাত্র ও যুব সমাজরাই হল সুস্থ সমাজ গঠনের ভবিষ্যতের উত্তরসূরী। কেননা যুব সমাজ হল নিষ্ঠাবান, সৎ, চরিত্রবান ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হয়। এর ফলে তারা ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা করতে পারে। তাই আমার ধারণা, বর্তমানে যুবসমাজ যখন তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, সৎ ও ভাল কর্ম করবে, তারা তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হবে এবং তাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হলে তা সঠিকভাবে পালন করবে, তার ফলেই সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে। এর ফলে দেশ ও জাতি বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বলে আমি মনে করি।

প্রেম : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

ইসমোতারা বেগম
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ বাংলা অনার্স)

যদি প্রশ্ন করি ভালোবাসা কাকে বলে? বা প্রেম বলতে কী বোঝায়? তবে আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উপর ভিত্তি করে উত্তর পাই ভালোবাসা হল মানব হৃদয়ের অন্তরঙ্গ মিলন। যেখানে বিচ্ছেদ ঘটানো অসম্ভব। এই মিলন কখনই শারীরিক বা দৈহিক মিলন নয়, এ হল মানব আত্মার যুগলমিলন। কিন্তু আধুনিক সমাজে নব যুবক -যবুতী নারীরা ভালোবাসা বলতে দৈহিক মিলনকে বড়ো মনে করে। নবযুগের নরনারীরা প্রেম আর কামনাকে একই জিনিস মনে করে। কিন্তু প্রেম এবং কামনার দুটি পৃথক পৃথক সংজ্ঞা রয়েছে। স্ব-সুখ বাসনাহীন অনুভূতিই হল প্রেম। যা মানব হৃদয়কে নবীনত্ব দান করে। আর কামনা হল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সৃষ্টি অনুভূতি। যা মানুষের মনকে কলুষিত করে।

একদিনের ভালোলাগা কখনই প্রেম হতে পারে না। দীর্ঘদিনের পথচলার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে প্রেমের উদ্ভব হয়। একদিনের ভালোলাগা হল মানব হৃদয়ের কুবাসনা যা ক্ষণিকের অনুভূতি। আবার অন্যভাবে বলা যায় ভালোবাসার প্রথম ধাপ হল ভালোলাগা। পবিত্র প্রেম চিরকালের জন্য চিরন্তন সত্য। জীবনের কঠিনতম বাধা-বিপদের মধ্যেও যা অটুট ও দৃঢ় বন্ধনযুক্ত। আধুনিক যুগের নর-নারীরা নিজেদের যৌবনক্ষুধা নিবারণ করার জন্য দিনের পর দিন আদিম যুগের বন্য হিংস্র পশুর মতো অত্যাচারি হয়ে উঠেছে। নিজেরাই নিজেদের চরিত্র ও মানসিকতাকে নীচ করে তুলেছে। যদি মানুষ প্রেমের গূঢ়তত্ত্বটিকে পরিপূর্ণতা দান করতো তবে সমাজের বুকে ভ্রূণ হত্যার মতো নৃশংসতা, পৈশাচিকতা সৃষ্টি হত না। নর-নারীরা কামনার বশবর্তী হয়ে কত ভুল পথের দিকে পা বাড়ায়। এর ফলে মাতা-পিতাহীন কত নিষ্পাপ, কলঙ্কহীন সন্তানের জন্ম হয়। এই সন্তানগুলি সমাজে সম্মানের সহিত মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে না। তারা সমাজে কলঙ্কিত বলে উপেক্ষিত হয়। আধুনিক যুগে কামনা হল মানব জীবনে একটি মানবিক ব্যাধি স্বরূপ।

এখনকার নর নারী বাস্তব প্রেম বলতে কামনাকেই বড়ো করে তুলছে এর ফলে অনেক নারী পুরুষ পরস্পরকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করছে। এর ফলে অনেক নর-নারী নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে মৃত্যুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এভাবে কত নর নারীর প্রাণ অকালেই ঝরে পড়ছে। আবার অনেকের জীবনে স্থূলকামনা কালবৈশাখির মতো ঝড় তুলে দাম্পত্য জীবনের সুখ-এর বন্ধনকে ছিন্ন করছে।

কত নারী, পুরুষের দ্বারা শারীরিক নির্যাতিত হয়ে নিজের মর্যাদাকে হারিয়ে ফেলছে। এর ফলে সেই নির্যাতিতা নারী সমাজের কাছে কলঙ্কিনী নারী রূপে পরিণত হচ্ছে। এই নারীরা কখনই সমাজে একজন আদর্শ নারী রূপে ভূষিত হয় না। তারা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতেও পারে না। তারা নিজেদের দুঃখ কষ্ট প্রকাশ করার জন্য বাক্‌স্বাধীনতা হারায়। ধর্ষিতা নারী কখনই কলঙ্কিনী নয়, তারা হল নিরাপরাধ, নির্দোষ। যারা এই নারীদের প্রতি নির্মমভাবে অত্যাচার করে তারাই হল সমাজের কলঙ্ক। সমাজের এই ভক্ষক পুরুষদের আমরা কখনই মানুষ বলতে পারি না, কারণ তাদের মধ্যে 'মান' এবং 'হুশ' কোনটিই নেই, তারা হল অমানুষ।

আধুনিক যুগের মানব সম্প্রদায় 'ভালোবাসা' শব্দটির গভীরত্ব বুঝতে পারে না। তারা সর্বদা ভাবে ভালোবাসা হল 'ছেলের হাতের মোয়া'এর মতো যা সবর্দাই সবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। 'ভালোবাসা' শব্দরিট দিকে আমরা ভালোভাবে তাকালে দেখতে পাবো চারটি বর্ণ। যার প্রত্যেকটি বর্ণ দ্বারা এক একটি অর্থপূর্ণ শব্দকে প্রকাশ করা হয়। 'ভ' বর্ণটির দ্বরা 'ভক্তি', 'ল' বর্ণটির দ্বারা 'লজ্জা', 'ব' বর্ণটির দ্বারা 'বাস্তবতা' এবং 'স' বর্ণটির দ্বারা 'সততাকে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু নবযুগের প্রেমের মধ্যে প্রত্যেকটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। পবিত্র প্রেম যেমন মানব জীবনে কুসুম ফোটাতে পারে তেমনি আবার কামনাযুক্ত কু-বাসনা মানুষকে পদে পদে মৃত্যুর দিকে পতিত করে।

বিশ্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভালোবাসা সম্পর্কে বলেছেন— 'বড়ো শক্ত বোঝা, যার বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।'

সমাজ ব্যবস্থার সেকাল ও একাল

মধুমিতা পাল
(প্রথম বর্ষ, সংস্কৃত অনার্স)

আমি সর্বপ্রথম 'সমাজ' কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ করার সাথে সমাজ ব্যবস্থার সেকাল ও একাল সম্পর্কে কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই। সমাজ কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Society' এবং সমাজ বলতে আমরা জানি যে 'আমরা যে এলাকায় বসবাস করি সেই এলাকার বাড়িঘর ও মানুষদের লইয়া যে একটা গোষ্ঠীমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, তাকেই সমাজব্যবস্থা বা সমাজ বলা হয়।

প্রথম প্রসঙ্গ : সেকাল অর্থাৎ আগেকার দিনে মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ-র ভিত্তিতে সমাজকে দুইভাগে ভাগ করেছিল। যথা উচ্চ সমাজ এবং নিম্ন সমাজ, উচ্চ সমাজ তৈরি হয়েছিল জমিদার, অভিজাত পরিবার, মহাজন, ধনী শিল্পপতিদের নিয়ে। এবং নিম্ন সমাজ তৈরি হয়েছিল সামান্য কর্মচারী, চাষি, ক্ষেতমজুর, হতদরিদ্র মানুষ এবং অস্পৃশ্যদের নিয়ে। এইসময় নিম্ন সমাজের মানুষদের উচ্চ সমাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু একালে অর্থাৎ এই আধুনিক যুগে সমাজের সেই বিভক্তিকরণ বজায় থাকলেও দুই সমাজের মানুষদের এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে প্রবেশের যে নিষেধকরণ ছিল তা অনেকটাই উঠে গেছে, ফলে এক সমাজের মানুষ (উচ্চ/নিম্ন) অন্য সমাজে (উচ্চ/নিম্ন) প্রবেশ করে সহজেই বসবাস করতে পারে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : সেকালে সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের পড়াশুনা এবং ঘুরে বেড়ানোর অগ্রাধিকার ছিল না। তবে এই নিয়মটা উচ্চ সমাজের মেয়েদের জন্য কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু নিম্ন সমাজের মেয়েদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম ছিল বাধ্যতামূলক। এরফলে নিম্ন সমাজের মেয়েদের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা ছিল বাধ্যতামূলক এর ফলে নিম্ন সমাজের মেয়েরা একদিক দিয়ে অর্থাৎ লেখাপড়ার দিক দিয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল।

তারপর যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আবির্ভূত হন তখন তিনিই এইসব পিছিয়ে পড়া মেয়েদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তার ফলে নিম্নগতিতে হলেও মেয়েদের শিক্ষার হার স্বল্প সংখ্যক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু একালে মেয়েদের পড়াশুনার অধিকারকে সরকার পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে এর ফলে মেয়েদের পড়াশুনা করার পথে যে অন্তরায় ছিল সেটাকে তারা এখন অতি অনায়াসে অতিক্রম করে লেখাপড়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এছাড়াও এখন মেয়েদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। ফলে মেয়েরা অতি অনায়াসে সেই সব বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে সেকালের তুলনায় একালের মেয়েদের শিক্ষার হার অনেক গুণ বেড়েছে।

তৃতীয় প্রসঙ্গ : সেকালের সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এই যে সময় ছেলে মেয়ে উভয়ের সমানাধিকার দেওয়া হয় নি। ফলত ছেলেরা যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। মেয়েরা সেই সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকত। এছাড়াও সেই সময় ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে পৃথক দৃষ্টিকোণ ছিল সমাজের। কেননা ছেলেদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হলেও কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয় নাই। কারণ সেই সময় মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর তার বাবা ও মায়ের হস্তক্ষেপ বেশি ছিল এবং সেই সময় ছেলেমেয়েদের মেলামেশা ও একসাথে ঘুরে বেড়ানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নাই। কারণ সমাজ এটাকে ভালো চোখে দেখত না। ফলত তারা বিভিন্ন অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত থাকত।

কিন্তু একালের সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেমেয়ে উভয়ের সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে। তার সাথে মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে। ফলে সমাজকে আধুনিকতার পর্যায়ে ফেলে পুরনো রীতিনীতিকে বাদ দিয়ে এখন ছেলে মেয়েরা একসাথে মেলামেশা করছে, ঘুরছে-ফিরছে এবং একসময় শ্লীলতাহানি হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে। এবং এই সময়ে মেয়েরা যেসব ছেলেদের সাথে মেলামেশা করছে তাদের ভালোমানুষি চেহারার পেছনে হিংসাত্মক মনোভাবের কাছে মেয়েরা আজ অসুরক্ষিত।

সুতরাং সর্বশেষে একথাই বলতে চাই যে পুরানো সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা যতটা সুরক্ষিত ছিল, এই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সমানাধিকার পাওয়া সত্ত্বেও ততটা সুরক্ষিত নয়।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজ

বরুণ দাস (বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ) সাম্মানিক

শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? শিক্ষা শব্দের অর্থ কী? শিক্ষার পরিধি কী? —আমরা অনেকেই এই সমস্ত প্রশ্নের প্রতিবাক্য বিষয়ে বিদিত আছি। অথচ অনেক শিক্ষাবিদ এই সমস্ত প্রশ্নের অনুসন্ধানে তাদের প্রযোজ্যমান বিধানগুলি প্রকটিত করেছে। কিন্তু আমরা সকলেরই সম্মতিকে প্রযোজ্য বলে গ্রহণ করে নিতে পারি না। কারণ, কাউকে খাটো করে, প্রিয়ত্বের বিচার করা যায় না। সব ভালোলাগার ভিতর থেকে যেটি হৃদয় মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়, তাকেই আমরা প্রিয়ত্বের অভিধায় ভূষিত করি।

ছাত্র জীবনের অগ্রগামী রথ নিরন্তর চলমান। আমরা রবি ঠাকুরের সেই কবিতা —

'ছোটো খোকা বলে অ-আ
শেখে নি সে কথা কওয়া।'

—আওড়ানো বচনের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার সর্জন লগ্ন শুরু করি। আর সেই লগ্নের অবসান ঘটে ছাত্র জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। কেননা ছাত্র জীবনের গগনে বারবার দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসে। এই দুর্যোগগুলি হল দারিদ্রতা, পারিবারিক সংকট প্রভৃতি। এই কারণগুলি ছাড়াও ছাত্র জীবনের অগ্রগামী রথের নিরন্তর চলমান পথে যে কারণগুলি বিশেষভাবে বাধা সৃষ্টি করে থাকে, সেগুলির মধ্যে শিক্ষকের অসহনীয় শাসন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মনো-মালিন্য ও সমাজের দুর্গতির কথা সর্বাগ্রে কথিত হয়। আমরা এই ভয়াবহ মহামারী থেকে ছাত্র জীবনকে অগ্রগামীর পথে অবিরাম চলমানতায় চালনা করার জন্য 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সমাজ' এই ত্রিশীর্ষক প্রক্রিয়াকে সাদরে বরণ করব।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আমরা অবহিত। কেননা শিক্ষা মানব সভ্যতার প্রতিবন্ধক নয়, মানবসভ্যতার উন্মেষদ্বার উন্মোচিত করে শিক্ষা।

শিক্ষার জ্যোতির্ময় আলোয় শিক্ষার অন্ধকার, অশিক্ষার অজ্ঞতা দূর হওয়ার সাথে সাথে সমাজ সংসার ও দেশও হবে জ্যোতির্ময়ী। কিন্তু চোখ থেকেও যারা অন্ধ, যারা জ্ঞানরাজ্যের রস-আস্বাদন থেকে বঞ্চিত, তাদের বিড়ম্বিত জীবন বড়ই দুঃখের। তাই সমাজের অগ্রগতিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলস্যের শয্যা ত্যাগ করে প্রত্যুষের উষালগ্নে জ্ঞানরাজ্যে আলোকরশ্মি বর্ষণ করতে হবে।

শিক্ষা একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া। জন্মের পর থেকে পিতা মাতা ও অন্যান্য বয়স্করা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষালয়ে পাঠান। যেহেতু শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সচেতনভাবে সমাজের উন্নতি সাধন ও সংস্কার সাধনে ব্রতী করে, তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর করণীয় বিষয় শিক্ষালয়ে গিয়ে নানারকমের সহমর্মিতা সূচক গুণের জ্ঞান, কৌশল ও শিক্ষা অর্জন করে সমাজের ভিতরে সামাজিক কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখা। আর এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পরিত্রাত করতে প্রয়োজন মিত্রতাবন্ধন। এই মিত্রতাবন্ধন গড়ে উঠবে, শিক্ষা প্রাঙ্গনেই। কেননা শিক্ষা প্রাঙ্গনে জাতিগত, অর্থগত, সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ অপসারিত হয়। পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিনিময়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় অপূর্ব মিত্রতা বন্ধন। যার ফলে এই শিক্ষার্থীরাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্থিতি-অবস্থায় (Social-Cultural-lag) অনড়তা ভেঙে ফেলে সমাজকে নতুন উদ্যোগে গতিময় প্রগতির পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে।

এতদ সম্প্রদায় বাক্যব্যয়ে আমরা উপনীত হতে পারি যে, শিক্ষা স্রোতে 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সমাজ'—এই পারিবারিক শিক্ষা পর্বতের শিখরে ভূষিত করা যায়। শিক্ষা ব্যাপকতর অর্থে জীবনের সাথে সমার্থক ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এই জীবনের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে আছে এই পরিবার। সেইজন্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এই পরিবারটিতে আত্মার ভিতর অর্থাৎ নিজের ভিতর থেকে গ্রহণ করা। আমরা তাই সংকল্প করব যে, এই পরিবার থেকে কোনো সদস্যকেই বহির্ভূত করব না বা উপেক্ষিত বলে দূর রাজ্যে পাঠিয়ে দিব না। কারণ আমরা 'শ্রীমদ্ভগবতগীতা'-য় জেনেছি যে অজ্ঞানতার বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে শিক্ষা। আর এই জন্যই আবশ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদান-প্রদানের অব্যাহত ধারা। তাইতো মনোবিদ কার্টিস (Curtis) বলেছেন —

'The Teacher is active in teaching and the pupil active in learning.'

শিক্ষালাভের প্রথম কথাই হল শিক্ষাদাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও বিনয়ভাব। 'ছত্র' শব্দ থেকে 'ছাত্র' শব্দের উৎপত্তি। ছাতা যেমন রোদ থেকে, বৃষ্টি থেকে শরীরকে রক্ষা করে, ছাত্রও তেমনি সর্বাধিক আঘাত ও নিন্দাবাদ থেকে শিক্ষককে রক্ষা করে বলেই সে ছাত্র। একইভাবে একজন আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে যথার্থ যোগ্যতা, পারদর্শিতা, দায়িত্বশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, সহানুভূতিতা, বিদ্যাবত্তা ও সর্বোপরি ছাত্রপ্রীতি তথা ছাত্রপ্রেম—প্রভৃতি গুণগুলি বিরাজমান থাকে, তবেই শিক্ষার্থীর অনন্তময় পথে জড়তাবোধ আসবে না। শিশু জন্মের পর মায়ের কাছ থেকেই ভাষাশিক্ষা পেয়ে থাকে। তবুও অ্যারিস্টটল বলতেন যে, 'শিক্ষকেরা যাঁরা শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা দেন তাঁরা শিশুদের পিতা মাতার থেকে বেশি সম্মানীয়'—কারণ পিতামাতারা শিশুদের শুধুমাত্র জন্ম দেন, কিন্তু প্রতিটি শিক্ষার্থীর সুস্থ ও সভ্য জীবন বিকাশে সাহায্য করেন এই শিক্ষক মহল।

শিক্ষার লক্ষ্য হল 'শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা।' আর এই বিকাশ সাধনে শিক্ষকের ভূমিকা থাকবে ব্রহ্মা নয়, বিষ্ণুর ন্যায়। কেননা, পিতা মাতার মতো ব্রহ্মাও সৃষ্টিকর্তা, আর পালন কর্তা বিষ্ণুর ন্যায় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন শিক্ষক মহল। আমরা যদি প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকাই, তাহলে দেখব—শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা ছিল শিষ্যকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে যাত্রায় সাহায্য করা। কেননা তৎকালে শিক্ষকের কর্তব্যের তালিকা ছিল বিশাল। শিষ্য তাঁর কাছে ছিল পুত্রসম। গুরুশিষ্যের সম্পর্কও ছিল মধুর। বর্তমানেও একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর পথ প্রদর্শক, সহায়ক, দার্শনিক, পিতার মতো একাধারে ফ্রেন্ড ও প্রকৃত সুপরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

দুটি কবিতা

অধ্যাপক রাজন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ)

ঘুড়ি

কী ভালো ঘুড়ি ওড়াতে পার
কতটা ছাড়তে হয় সুতো
কখনইবা গুটিয়ে নিতে হয়
এসবই জানা আছে ভালো
এমনই মাজা ও হাতের জাদুতে
কত ঘুড়ি হল ভোকাট্টা আকাশে আকাশে
বাতাসে তাদেরই কান্নার দুলে দুলে
মরে যাওয়া দেখি

আয়নার সম্মুখে

ক্রুদ্ধ আমির সাথে দেখা হয় আয়নার সম্মুখে
মৃত আমির সাথে নিত্য কথকতা
জীবন্ত আমিকে রেখে এসেছি তোমার উদ্যানে
ফুল ফোটানোর কাজে;

শান্ত আমি নদীর মতো পরিপাটি
ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না
ক্রুদ্ধ আমি আয়নার নির্দ্বিধায়
ভেঙে ফেলে কাচ
মৃত 'আমি' নরকের কাব্য লিখে যায়

জীবন্ত 'আমি'কে আমি
রেখেছি তোমার উদ্যানে
ফুল ফোটানোয় সে মুগ্ধ জাদুকর!

ব্যথা এসেছিল

কেয়া দাস (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

ব্যথা এসেছিল, চলে গেছে—
দিয়ে গেছে প্রতিশ্রুতি— 'আবার আসব ফিরে'।
আমি একা বসে আছি নদীর বালুচর তীরে।
চারিদিকে খুঁজে দেখি মেলে না তার দেখা।
নিস্তেজ মনে আমি বসে আছি একা।
কেন ব্যথা এলো? কেনই বা গেল চলে?
ফিরে আসবার কথা, কেনই বা গেল বলে?
ব্যথা আসার চেয়ে তার চলে যাবার ব্যথা ততোধিক,
ব্যথা ছাড়া আমি শূন্য, শূন্য দশ দিক।
আমি ছিলাম একা নিঃসঙ্গ,
আমার প্রাণে ব্যথা এসেছিল, দিয়েছিল মোরে সঙ্গ।
শুধু তার চলে যাবার ব্যথা রয়ে গেল।
সেই ব্যথা আজ হারিয়ে গেল, দিল না আজও সায়,
আমি দাগ কেটে কেটে দিন গুণি শুধু তারই প্রতীক্ষায়।

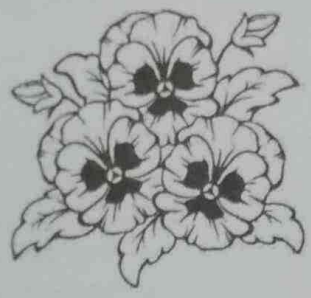

বৃক্ষের ছেদন

মাম্পী দাস (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

উড়ন্ত বালি, ভরা জল, ঝরা বৃষ্টিতে
একদিন ধুয়ে যাবে, আছে যত পাপ।
বড়ো বড়ো বাড়ির দিকে চেয়ে মানুষ
করছে বৃক্ষ ছেদন,
সেই বৃক্ষের অন্তরালে হবে একদিন
সত্যের অপলাপ।
অভাবই স্বভাব শেখায় সকল প্রাণীকে
তাইতো মানুষ কাঁদে এক ফোঁটা
বৃষ্টিকে কাছে পেতে।
অঝোরে অসহায় ভাবে কাঁদে সকল প্রাণী
তাই তো আজ, চারিদিকে শুধুই ধু ধু বালি।
তবু, আশা রাখি, ভরা জল, ঝরা বৃষ্টিতে,
একদিন ধুয়ে যাবে, আছে যত পাপ।

শিক্ষক দিবস

অনিন্দিতা দাস
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স)

বছর বছর আসছে ফিরে,
একটি খুশির দিন।
আনন্দে আর উল্লাসে মেতে ওঠে
এই শিক্ষক দিবসের দিন।
শিক্ষক হলেন শিক্ষাগুরু
দেন যে মোদের শিক্ষা।
চলার পথে সঠিক পথে
দেন যে মোদের দীক্ষা।
বন্ধু হয়ে পাশে থাকেন
আদর্শকে মানিয়ে রাখেন।
সত্য পথে চলতে শেখান
সত্য কথা বলতে শেখান।
শিক্ষক হলেন সবার গুরু
শিক্ষা হল জীবনের শুরু।
তাই —
৫ই সেপ্টম্বর দিনটি যেন
আসছে ফিরে ফিরে।
থাকছে না কোনো দুঃখ
এই দিনটিকে ঘিরে।
শিক্ষকদের আর্শিবাদ নিয়ে
শুরু হয় দিন
এই দিন মনে রাখব
ভুলব না কোনো দিন।

কোথায় তুমি

শ্বেতা কর্মকার
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, দর্শন বিভাগ)

কোথায় তুমি লুকিয়ে আছো, মেঘের আড়ালে।
— তোমার দেখা হবে কবে, কোথায় হারালে!
কোথা হতে ডাকছো তুমি, দেখতে না পাই চোখে
কোথায় যেন হারিয়ে গেছো, কোন্ অমৃতলোকে।
— কোথায় তোমায় খুঁজি আমি এই ভুবনে
তোমার দেখা পাবো কি এই ভাঙা জীবনে।
কোথা হতে বলছো যেন, আমার কানে কানে
শুনতে পাই, দেখতে নাহি পাই গো নয়নে।
হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পাই নুপুর ধ্বনি
এদিক ওদিক খুঁজে দেখি, কোথায় বলো তুমি?

ভেদাভেদ

সনেল হাঁসদা
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

ধর্মের ভেদাভেদের জন্য, সমাজে মানুষ মানুষকে মারে
ভুলে গেছে তারাও সমাজের মধ্যে জন্মেছে মানুষ হয়ে।
নানারকম মানুষ এখন নানা ধর্ম মানে
কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ খ্রিস্টান আছে বহুজনে।
একই স্রষ্টার পূজা করে তারা বিভিন্ন রকমভাবে
কেউ মন্দিরে, কেউ মসজিদে, কেউ গীর্জায় এইরূপ নানাভাবে।
একই মায়ের সন্তান তারা, রক্ত তাদের লাল।
এই কথা বুঝে উঠতে তাদের, কেটে যায় বহুকাল।
এসো বন্ধু সবাই মিলে নতুন সমাজ গড়বো
যে সমাজে সবাই আমরা গলাগলি হয়ে থাকবো।
যে সমাজে নেই ভেদাভেদ, ছোট বড় পরিচয়
সেখানে শুধু থাকবে মোদের মানুষ বলে পরিচয়।

লুকানো ভালোবাসা

অনিতা দাস
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, দর্শন বিভাগ)

ভালোবাসার বুক ভরে
লুকিয়ে রাখি তোমায় জেনো
নীলচে রাতের
জ্যোৎস্না ভেজা আলো।।
তোমার জন্য রইল আমার
স্বপ্ন ভেজা ঘুম।
একলা থাকার ক্লান্ত দুপুর
একলা ক্লাসরুম।।
তোমায় দিলাম সকাল বেলার
উনুন ঘেঁষা আঁচ
তোমায় দিলাম বৃষ্টি ভেজা
সবুজ পাতার সাজ।।
খাতার ভাঁজে রাখা তোমার অজানা চিরকূট
তোমার জন্য রইল কিছু ভাষা, যে অস্ফুট।।
ভালোবাসার বুক ভরে, লুকিয়ে রাখি
নীলচে রাতের জ্যোৎস্না ভেজা আলো।
তোমার জন্য থাকে শুধু স্বপ্ন ভেজা ঘুম,
একলা দুপুর, ফাঁকা ক্লাসরুম।

স্বার্থপরতা

সীমা দাস
(বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

যুগযুগান্তর ধরে বর্তমান কাল পর্যন্ত
চলে আসছে মানুষের স্বার্থপরতা।
মানুষ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য
করে চলেছে অন্যায় অত্যাচার।
আগের যুগে জমিদার থেকে রাজারা সবাই
নিজের মতো রাজ্য চালাবার জন্য
কত রক্তপাত করেছে।
তার জন্য বলি দিতে হয়েছে
কত অসহায় গরিব মানুষদের।

বর্তমান সমাজের মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য,
মানুষ খুন করতে পিছপা হয় না।
মানুষ স্বার্থের জন্য মানুষকে
অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছে।
আবার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে
ঢিলের মতো ছুঁড়ে ফেলছে।

বর্তমান সমাজে মানুষ চিনতে
মানুষ আজ ভয় পাচ্ছে।
কারণ মানুষ আজ পশুর মতো
হিংস্র হয়ে উঠেছে।
যে কোন সময় কামড় দিতে পারে।

পৃথিবীটা যেন স্বার্থে পরিপূর্ণ
কোথাও কী নেই এর থেকে নিস্তার?
তবু আজও আমি জানি —
পৃথিবীতে মন্দ মানুষ থাকার সাথে সাথে
কিছু সৎ, সত্যবাদী ও প্রতিবাদী
মানুষও আছে।
যারা স্বার্থপরতাকে দূরে সরিয়ে
মানুষের পাশে দাঁড়াবে বন্ধুর মতো হয়ে
এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মা

রাজু দাস
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স)

মা কথাটি ছোট্টো তবু
শুনতে ভালো লাগে,
মা যে সবার কত প্রিয়
সবার মনে জাগে।
মা যে মোদের কোলেপিঠে
মানুষ করে থাকে।
বড় হয়ে এই কথাটি
কেউ কি মনে রাখে?

চরিত্র

করবী সরকার
(প্রথম বর্ষ, সংস্কৃত অনার্স)

নিজের ভাষার উপর ধ্যান দাও,
চরিত্র গঠন হবে।
চরিত্রের উপর ধ্যান দাও,
কাজের সন্ধান পাবে।
কাজের উপর ধ্যান দাও,
ভাগ্য তৈরি হবে।
ভালোবাসার উপর ধ্যান দাও,
সম্পর্ক তৈরি হবে।

ইতিহাস

অয়ন দাস
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ)

এক অবাঞ্ছিত বিষয় তুমি ইতিহাস।
কারও কাছে নোট মুখস্থ, কারো কাছে ত্রাস।
কারও কাছে রাজায় রাজায়, যুদ্ধ রক্তপাত।
(আবার) কারও কাছে বানানো আষাঢ়ে গল্পে বাজিমাত।।
আসলে ইতিহাস ছাড়া জীবন একটা ফাঁকি।
ইতিহাস ছাড়া মানুষের নিজের অস্তিত্ব আছে নাকি?
অতীত ও বর্তমানের সূত্রধর হল ইতিহাস।
অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ফেলি পরম শ্বাস।
যদি আমরা ইতিহাসের কাছে না যাই
তাহলে, আমরা মোদের বংশ গৌরব কোথায় পাব ভাই।

ভূমিকম্প

সুপ্রিয় ঘোষ
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

হঠাৎ সেদিন সারা দেশে হল ভূমিকম্প
থরথরিয়ে উঠল কেঁপে ঘর বাড়ি পালঙ্ক
দরজা জানালাগুলো ঠক্ ঠক্ নড়ে
আলমারীর জিনিসগুলি মেঝের উপর পড়ে।
প্রলয়ের ভয়ে সবে কয় হায় হায়
বাড়ি বাড়ি মেয়েরা সব শঙ্খ বাজায়।
আতঙ্কেতে সবলোকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে
জমায়েত হয় ফাঁকা পথের উপরে।
কত বাড়ি ভেঙে পড়ে, কত লোক মরে
কত লোক নিখোঁজ হয় ধ্বসে চাপা পড়ে।
কেহ প্রাণে বেঁচে যায়, ভাঙে হাত-পা
কারো বা কপাল কাটে, রক্তে ভিজে গা।
ঘরের কম্পনে কেহ পেয়ে আতঙ্ক
বহুতল ছাদ থেকে কেহ দেয় ঝম্প।
ভূমিকম্প থেমে গেল, ঘর না পড়িল
ঝাঁপ দেওয়া লোকজন সকলে মরিল।
ভূমিকম্পে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে হয়
দৌড়ে পালানো ভালো, ঝাঁপ দিয়ে নয়।
দিশেহারা হয়ে লোকে ইষ্টদেবে কয়
রক্ষা কর গো প্রভু, থামাও প্রলয়।।

মিনি

কেয়া দাস
(বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

ছোট্টো মিনি ছোট্টো মিনি খেলছিল হায় বসে,
হঠাৎ করে বৃষ্টি এলো খেলা ভাঙল শেষে।
নতুন পুতুল, মাটির বাড়ি গেল যে সব ভিজে
সেখানে বসেই ভিজল মিনি কাঁদল সে নীরবে।
মনে পড়ল মায়ের আদর মায়ের বকুনি —
'সন্ধ্যা হল, খেলা ছেড়ে, আয় ঘরে আয়, মিনি।'
আজ সন্ধ্যা শেষে আঁধার হল খেলছিল আনমনে,
হঠাৎ খেলা, ভেস্তে দিতে, বৃষ্টি এলো নেমে।
ভাবল মিনি মনে মনে, ফেলল চোখের জল —
মা বুঝি আজ উপর থেকে দেখছিল সারা বেলা,
মায়ের কথা শুনিনি তাই বন্ধ হল খেলা।
তারা হয়ে তুমি আছ, কোলে নাও একবার,
কতদিন দেখিনি তোমায়, ইচ্ছে করছে দেখবার।
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, কাঁদল মিনি, ডাকছিল তার মায়,
আহা-রে অভিমানে, সেই ছোট্টো মিনি, লুটাল কাদায়।

আমার দেশ

রাজু দাস
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স)

ভারত আমার দেশ
আছি হেথায় বেশ।
ভারতবর্ষের মাটি।
সবচাইতে খাঁটি।
ভারতের জলবায়ু
বাড়ায় আমার আয়ু।
ভারতবর্ষের আকাশ
হেথায় আমার প্রকাশ।
ভারত আমার দেশ
গর্বের নেই শেষ।

ভালো লাগে

মানজুলা খাতুন
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ)

ভালো লাগে রাখাল ছেলের মধুর সুরের বাঁশি
ভালো লাগে, শিশুর মুখের পাগল করা হাঁসি।
ভালো লাগে, সকাল বেলার পাখিম কলতান
ভালো লাগে, কুঞ্জবনে মৌমাছিদের গান।
ভালো লাগে, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা
ভালো লাগে, নদীর জলে রুই, কাতলার খেলা।
ভালো লাগে, সাঁঝের বেলা হাসনাহেনার সুবাস
ভালো লাগে, শিশির ভেজা ভোরের দূর্বাঘাস।
ভালো লাগে, ডিঙি বেয়ে জেলের মাছ ধরা
ভালো লাগে, গাছের ফাঁকে বৃষ্টি ঝরে পড়া।
ভালো লাগে, বসন্ততে কোকিলের ওই ডাক
ভালো লাগে, টিনের চালে কবুতরের ঝাঁক।
ভালো লাগে, সাগর নদী, ঝরণা এবং পাহাড়
ভালো লাগে, সবুজ গাছে লাল গোলাপের বাহার।
ভালো লাগে, গ্রাম বাঙলার কুয়াশা ঘেরা ছবি
ভালো লাগে, এক-কথায় এই পৃথিবীর সবই।

আমি কি ভালোবাসি

আবিদা সুলতানা
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ)

ভালোবাসি লাল ফুল
ভালোবাসি নীলাকাশ।
ভালোবাসি পদতলে
নরম সবুজ ঘাস।
ভালোবাসি বসন্তের
কোকিলের ডাক,
সেই সাথে উড়ে যাওয়া
পাখিদের ঝাঁক।
ভালোবাসি বিছানায়
হালকা চাঁদের আলো,
আবছা ঘুমের চোখে
মা-র মুখ বাসি ভালো।
ভালোবাসি কাঁচা আম
সাথে কুল করমচা,
সবচেয়ে ভালোবাসি
সকালে গরম চা।

জাতের দ্বন্দ্ব

নারায়ণ বিশ্বাস
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স)

কে বলেছে আমি হিন্দু,
তুমি মুসলমান?
কে বলেছে আমি জৈন,
তুমি যে খ্রিস্টান?
জাতে জাতে কীসের লড়াই,
কীসের এত দ্বন্দ্ব?
মানুষ আমরা, জেনো সবাই;
এসো লড়াই করি বন্ধ।
বাংলাদেশে জাতের মধ্যে
বিরাট বড়ো দ্বন্দ্ব,
এতে কোনো লাভ হবে না,
হবে দেশের মন্দ।
হিন্দু আমি, মুসলমান তুমি
করব কেন দ্বন্দ্ব?
সবাই মিলে মিলেমিশে
করি এসো আনন্দ।

বৃষ্টি

মুনিয়ারা খাতুন
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

হে বৃষ্টি —
ধরণী যে আজ তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে,
ধরণী যে আজ শুধু তোমারই চিন্তায় মগ্ন।
হে বৃষ্টি —
তুমি এলেই ধরণীর প্রকৃতি সবুজ হয়ে উঠবে,
শস্য-শ্যামলে, ফলে-ফুলে ভরে যাবে।
হে বৃষ্টি —
তুমি এলেই সৌন্দর্যময় হয়ে উঠবে এই চরাচর,
এই পৃথিবীর মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হবে।
হে বৃষ্টি —
তুমি এসো, নেমে এসো, এই ধরণীর বুকে
আমরা লিপ্ত হব পৃথিবীর সকল আকাশে।

হৃদয়ের আয়না

আবু সুফিয়া
(বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ)

তুমি আয়নার সামনে যাও এবং নিজেকে দেখ
এবং দেখ আয়নার ভেতরের মানুষটা তোমাকে কি বলতে চায়,
যার কথা তোমার জীবনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
সে হল সেই মানুষ, যে আয়নার ভেতর থেকে
তোমার দিকে চেয়ে আছে।
কিছু লোক তোমাকে যতই বলুক
তুমি তাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু,
তোমাকে যতই বলুক
তুমি সবচেয়ে সুন্দর মানুষ
কিন্তু সেই আয়নার ভেতরের মানুষটা বলে দেবে
তুমি কেমন।
সারা পৃথিবীর চোখে ধুলো দিয়ে
নিজেকে কখনো ঠকায়ো না।
তোমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু আয়নার ভেতরের মানুষটা
কারণ শেষ পর্যন্ত তোমার পাশে
আয়নার ভেতরের মানুষটাই রয়ে যাবে।
আর সেই তোমার প্রতিটা বিপদে তোমার পাশে থাকবে।
যদি তুমি তোমার সামনের আয়নার মানুষটিকে ঠকাও
তাহলে তোমার শেষ পুরস্কার
হৃদয়ে বেদনা আর চোখের জল ছাড়া
কিছুই হবে না।

হতাম যদি

দেবরাজ দাস
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, দর্শন বিভাগ)

হতাম যদি একটি নদী।
আপনার মনে চলতাম বেয়ে
দুপারের ঘাস লতাপাতা ছুঁয়ে
থাকত যদি ভরা যৌবন।
কাগজের নৌকা চলতাম বেয়ে
সুখের ছোঁয়ার মোহনাকে পেয়ে।
তুমি পারবে ফিরিয়ে দিতে
মোহনা হয়ে নদীকে পেতে।।

হতাম যদি ঠাণ্ডা বাতাস।
আমার ঠিকানা জানিয়ে দিতাম
প্রাণটা তোমার জুড়িয়ে দিতাম।
পড়ত যদি গ্রীষ্মের কাল।
কোকিলের ডাক শুনিয়ে যেতাম
মনটা তোমার ভরিয়ে দিতাম।
কী করে সরে থাকতে দূরে
মানুষ হয়ে বাতাস পেয়ে।।

হতাম যদি বর্ষার মেঘ।
রব তুলতাম আষাঢ়-শ্রাবণ
রাঙ্গিয়ে দিতাম তোমার যৌবন।
থাকত যদি কোনও ত্রুটি।
আমার ছোঁয়ায় সারিয়ে দিতাম
মেঘময় রোদে খেলা করতাম।
কী করে সরে থাকবে দূরে
মাঠের সোনা ফসল হয়ে।।

হতাম যদি শীতের সূর্য
ঝরিয়ে দিতাম ঘাসের উপর
রাতের জমানো সুখের শিশির
কোথাও যদি শীতের রোদে।
লাগত সকাল বড়ই মিষ্টি
নিশির জমানো শীতের সৃষ্টি।
পারবে তুমি শীতের হয়ে
রোদের মিঠা ছোঁয়া না নিয়ে।।

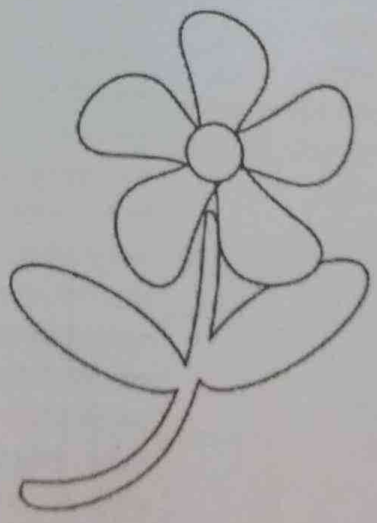

কে তুমি

ওয়াসিম আকরাম
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

কে তুমি
কি তোমার পরিচয়
কি তোমার রঙ
ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর
জীবের স্রষ্টা হয়ে
ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প হয়
সবই তোমার ইশারায়
কে তুমি
কি তোমার পরিচয়
মিথ্যাকে পাপ বল
সত্যকে পূণ্য বল
তুমি রয়েছো
সকল মানবের
যকৃতের
প্লীহায় প্লীহায়
কে তুমি
কি তোমার পরিচয়
যুগের পর যুগ ধরে
বিশ্বের বাণীর
স্রষ্টা হয়ে
তুমি রয়েছো
প্রতিটি বৃক্ষের
ছায়ায় ছায়ায়
কে তুমি
কি তোমার পরিচয়
রবি শশি
উঠে বসে
পাহাড় পর্বত
দাঁড়িয়ে রয়
সবই তোমার ইশারায়
কে তুমি
কি তোমার পরিচয়
রূপের সৌন্দর্য দিয়ে
ফুলের সুগন্ধ হয়ে
রয়েছো তুমি
প্রতিটি পাপড়ির
কণায় কণায়
কে তুমি
কি তোমার পরিচয়।

স্বাধীনতার এতকাল পরেও নারী

প্রিয়াঙ্কা দাস
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স)

স্বাধীনতার এতকাল পরও
কেন নারী হয়নি স্বাধীন?
কেন আজও তাদের
দেখতে হয় কান্নাভেজা দিন?
কেন নারী আজও পায় না
তাদের প্রাপ্য সম্মান?
কেনই বা গায় না কেউ
তাদের জয়গান?
কেন আজও লোকে বলে,
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য
এ সংসারে তাদের দামটা
এখনো কেন রয়ে গেছে শূন্য?

কেন আজও দিতে হয়
বিসর্জন তাদের প্রাণ
পুরুষ শাসিত সমাজে
বাঁচাতে নিজের মান।
কেন ঘরে বাইরে এখনও
নারী হয় লাঞ্ছিত?
কেনই বা তারা প্রকৃত
স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত?
স্বাধীনতার এতকাল পরও
হয়নি কেন তাদের সদ্‌গতি
এভাবেই কি তবে
চলছে দেশের উন্নতি?

স্বাধীনতার এতকাল পরও
ঠিক পালিত হয় স্বাধীনতা।
তবু কেন এই সমাজ
ভুলে যায় নারীদের কথা?

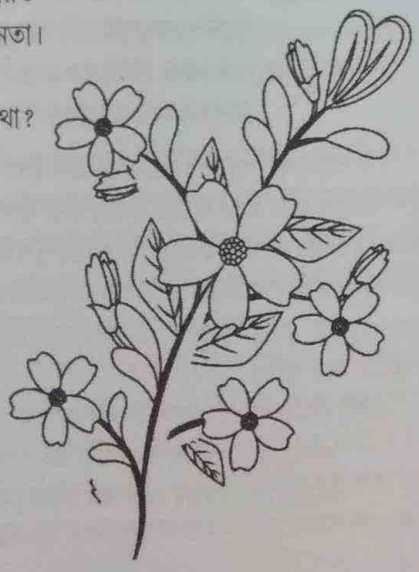

ভারত

সামিউল আলম
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স)

ভারত আমার জন্মভূমি, ভারত আমার দেশ,
এই দেশেতে জন্মেছি মোরা, এই দেশেতে হবো শেষ।
জন্ম নিয়ে দেখি যখন, এই ভারতের মাটিতে,
দেশকে আমি উজ্জ্বল করে, রাখবো আমার মাথাতে।
ভারতের মাটিতে হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই,
দেশকে মোরা রক্ষা করবো, এই প্রতিজ্ঞা করি তাই।
বাইরের শত্রু আসে যদি, আক্রমণ করতে ভারতে,
দেশকে মোরা রক্ষা করবো, শহিদের-ই তাগিদে।
ভারতের জন্য লড়বো মোরা, দেশকে করবো জয়,
শত্রুর পক্ষে লড়বো মোরা, দেশকে করতে দেবো না নয়ছয়।
ভারত আমার জন্মভূমি, ভারত আমার দেশ,
এই দেশেতে জন্মেছি মোরা, এই দেশেতে হবো শেষ।

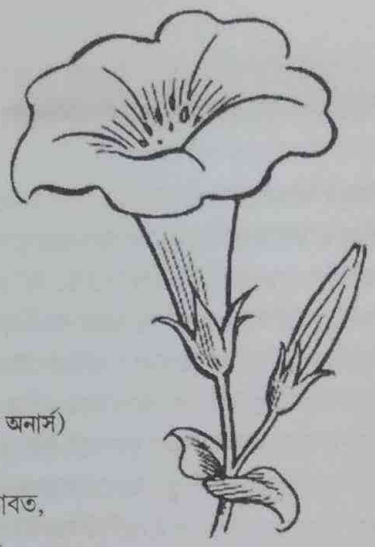

অকাল মরণ

মাম্পী দাস
(বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

সবাই যদি সবার কথা ভাবত,
তাহলে এই পৃথিবীটা —
কত না সুন্দর হত!
সবাই যদি এক সুরে গান গাইত,
তবে এই পৃথিবীতে —
একটিই সুর বাজত।
সবাই যদি এক দৃষ্টিতে দেখত,
এই পৃথিবীতে একটাই ছবি থাকত।
মনটা যদি সবার এক হত,
পৃথিবীটা সব সময় শান্ত থাকত।
শান্ত হাওয়ার অশান্ত সমাজ
চারিদিকে খুন-খারাপি আর কাটাকাটির রাজ।
রক্তের রাঙা এই পৃথিবীতে
অকাল বোধন সব কিছুতেই
তাই তো বলি আলো জ্বলুক
সব মানুষের অন্তরে।

প্রকৃতির করুণ পরিণতি

অনামিকা দাস
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, ইংরাজি অনার্স)

আমরা মানুষ, আমাদের মধ্যে রয়েছে কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা। পৃথিবী সৃষ্টির সময় মানুষ এত যান্ত্রিক ছিল না। আস্তে আস্তে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা আরো আধুনিক হয়ে উঠেছি। আমরা সকলে ইঁদুর দৌড়ে ছুটে চলেছি। অর্থ আর সম্মানের উদ্দেশ্যে। নিজেকে অনুধাবন করার মতো সঠিক সময় পাই না আমরা। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি।

নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের পরে থেকে সমানে তৈরি হচ্ছে কলকারখানা, দূষণকারী ধোঁয়াযুক্ত গাড়ি, মোটরবাইক এরকমই আরো অনেক কিছু। আমাদের দেশ শিকার হচ্ছে দূষণের। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, জলদূষণ ইত্যাদি এককথায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে আমাদের আনন্দের জন্য, সৌখিনতার জন্য। সৌখিনতা বলতেই মাথায় আসে ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশান, মোবাইল ফোন আরো অনেক কিছু। এদের কারণে আজ অনেক পশু-পাখিই প্রায় লুপ্ত। আমাদের বিভিন্ন প্রকার নতুন রোগের উপসর্গও দেখা দিচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে। তাছাড়া বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য খাদ্যে ভেজাল তো রয়েছেই। খাদ্যের মধ্যে থাকা গুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রাসায়নিক সার আর কীটনাশকের জন্য। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা যান্ত্রিক বস্তু ব্যবহার করে চলেছি সেটা জেনে হোক বা না জেনেই হোক। আমরা যেমন একদিকে নিজেদের ইচ্ছে পালন করে চলেছি, তেমনি অন্যদিকে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছি।

প্রকৃতি বা কত সহ্য করবে আমাদের এই অত্যাচার, তারও তো সহ্যের সীমা রয়েছে। তাই প্রায় যখন তখনই হচ্ছে ভূমিকম্প। যে কোনো সময় বৃষ্টিপাত, অতিবৃষ্টি, বজ্রপাত। এককথায় বলতে গেলে আগের ঋতু আর নেই। কখনও বা এমন খরা যার ফলে নদীনালা সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, কখনও বা বন্যা এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন —

'প্রকৃতির অতিক্রমণ কিছু দূর পর্যন্ত সই, আর তারপর আসে বিনাশের পালা।'

তাছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গান অনুযায়ী আমরা আমাদের প্রকৃতিকে, দেশকে সুজলাং সুফলাং বলে থাকি কিন্তু এখন আমাদের দেশ আর সুজলা নেই। গাছপালা কেটে তৈরি হচ্ছে দশ-বিশ তলা ফ্ল্যাট। আমরা বিজ্ঞানে আবদ্ধ, প্রকৃতির দিকে খেয়ালই নেই আমাদের।

তাই মুর্খতার কারণে আমার একটা কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে দেশবাসীর মানুষকে :

'বিজ্ঞানে অজ্ঞান তুই করে যাস ভুল
প্রকৃতি রহস্যময়ী নাই তার কূল
ভাঙাগড়া তার খেলা, স্থিতি লয় তার লীলা
মানুষ তাহার হাতে খেলার পুতুল।'

তাই আমাদের প্রকৃতির দিকে খেয়াল রাখা উচিত, বঙ্গভূমি যে দেশে জন্মেছি তার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য করা উচিত। যেমনটা আমরা বাবা মায়ের প্রতি করে থাকি। তাই সর্বপ্রথমে পৃথিবীকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে। লাগাতে হবে গাছপালা। তাই আসুন আমরা আমাদের পরিবেশকে আবার সুজলা সুফলা করে তুলি। আমাদের মাকে আবার ধনধান্যে প্রস্ফুটিত করে তুলি।

একটি গানের মাধ্যমে প্রকৃতির বন্দনা করি :

'ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা'

— দ্বিজেন্দ্রনাথ লাল রায়

আজ শিক্ষার কী পরিণতি!

আয়েষা খাতুন
(বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

'তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না। যা বিশ্বসভার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।'
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শিক্ষা' শব্দটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। এমনকি আমাদের ইহজীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, বিশেষ দরকারি ও সর্বমূল্যবান একটি শব্দ। এই শব্দের এমন আলো রয়েছে; যা সোনা, হিরে, মুক্তোর আলোর চেয়েও অনেক বেশি উজ্জ্বল, ঝক্‌ঝকে। এই শব্দের একটুখানি আলো আমাদের মনে এসে পড়লে, মন হয়ে ওঠে কুসংস্কারহীন, উদার। এর আলোতে আমরা শিখি বড়োদের শ্রদ্ধা-সম্মান করতে, ছোটোদের ভালোবাসতে ও স্নেহ করতে, অভুক্তকে অন্নদান করতে, তৃষ্ণার্তকে জলদান করতে, পথ চলতে চলতে একটু সাহায্যের মাধ্যমে কারও উপকার করতে। এছাড়া শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিকতাবোধ ইত্যাদি অনেক কিছু। শিক্ষা শব্দের আলোর ঝল্‌কানি এত দূর-দিগন্তব্যাপী যে তা অল্পে ব্যাখ্যা করা যায় না।

কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় এই আলোর কী পরিণতি চলে এল? বর্তমানে একে যে শুধু তথ্য সরবরাহ ছাড়া আর কিছু বলে মনেই করা হচ্ছে না। এ কেমন সমাজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এখন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য দিন দিন পাল্টাতে শুরু করেছে।

একজন শিক্ষার্থীকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তার জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে তাকে পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করা-ই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে শুধু শিক্ষিত করে না তাকে সুশিক্ষিত, স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলে। কিন্তু বর্তমানে এটা ভুলে গিয়ে শিক্ষাকে কেবল ডিগ্রি অর্জনে পরিণত করা হচ্ছে।

হ্যাঁ, আমি মানছি, শিক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি করতে হয় এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা হতে হয়। কিন্তু শুধু ডিগ্রি অর্জন করাই তো শিক্ষা নয়! শিক্ষা জীবনব্যাপী। আজকের শিক্ষার্থীরা সেটা ভুলে গিয়ে শুধু ডিগ্রি অর্জন করতেই ব্যস্ত। বইয়ের পড়া আত্মস্থ না করে মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে উগরে দিতে ব্যস্ত। পড়া তো মুখস্ত করতে হবে, ভালো রেজাল্টও করতে হবে এবং একটা চাকুরি নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রচেষ্টাও রাখতে হবে। তাই বলে কি কিছু নিজেকে বুঝতে হবে না? কিছু জ্ঞান অর্জন করতে হবে না?

শিক্ষার এই পরিণতির জন্য কী কেবল শিক্ষার্থীরাই দায়ী? আর কারও, কোনো বিশেষ অবদান নেই? অবশ্যই রয়েছে। দায়ী সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান যারা শিক্ষাকে 'নোটস'-এ পরিবর্তন করেছে। আমরা শিক্ষা অর্জন করার জন্য গাইড হিসেবে অনেক সময় কোচিং গুলোতে অ্যাডমিশন নিয়ে থাকি। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান গুলি কোনোরকম বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষার্থীর মনে ছায়াপাত করার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। তারা বোঝে শুধু নোটস্ আর নোটস্। এই সেদিন আমি বাড়ি ফেরার পথে দেখছি দেওয়ালে কিছু প্রচারের পোস্টার আটকানো আছে। সেগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার চোখে এমন কিছু পড়ল যে আমি অবাক হয়ে একদৃষ্টিতে অত্যন্ত দুঃখ, কষ্ট, বেদনার সঙ্গে তাকিয়ে থাকলাম। কাকে কী বলব, কোন বিদ্রোহের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হব, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। সেখানে লেখা ছিল —

'কোচিং সেন্টার অ্যান্ড নোটস সেন্টার'
এই লেখা আমাকে মর্মাহত করল।

সমাজে শিক্ষার এই অবস্থা দেখে খুব শোকাবহ হয়ে পড়ি। তাই এর বিরুদ্ধে আপন মতামত প্রকাশ করার জন্য কলম ধরলাম। শিক্ষাকে সুগঠিত করার জন্য অর্থাৎ পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য কিছু নোটস্ এর প্রয়োজন আছে। তাই বলে শুধু নোটস্ দেওয়ার জন্য কোচিং খুলে রাখলে চলবে না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কোচিংগুলোকে Text Book পড়ানোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে হবে। আর সেই দোকানদার দাদাদের উদ্দেশ্যে জানাই আপনার দোকানে 'কিছু শেখা যায়', 'জ্ঞান অর্জন করা যায়' এমন বই রাখুন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করুন।

ছাত্র-ছাত্রীদেরও বলি, তোমরা পাঠ্য বিষয়টিকে আগে বোঝার চেষ্টা করো, তারপর না হয় নোটস্ এর খোঁজ করবে।

বিদায় বেলা

বর্ণালী চৌধুরী
(বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

"আমরা ছোট থেকে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা করি এবং স্কুলে ভর্তি হই। মা-বাবারা বা গুরুজনেরা আমাদের স্কুলে রেখে দিয়ে আসেন। আমরা প্রথমে যেতে চাই না ভালো লাগে না বলে কিন্তু পরে ক্রমশ যেতে যেতে সেটাই আমাদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তাই। এখন বড়ো হয়েছি কলেজে পড়াশুনা করছি। আগে কলেজ মানে কি ভাবতাম! যেন পড়াশুনা কিছু হয় না শুধু সাজগোজ আর আড্ডা। এখন মনে হয় না, কলেজ একটা মহান জায়গা সেখানে এসে আমাদের মানসিকতা বদলায়, কতকিছু শিখি-জানি, কত শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে সু-সম্পর্ক তৈরি হয় জ্ঞান হয়, সু চিন্তা জাগ্রত হয়। কিন্তু কি করে যে তিনটা বছর পার হয়ে যায় তা ভেবে পাই না। ইচ্ছে করে না যেতে, তবু যেন পেছন থেকে কে তাড়াচ্ছে। মনে হয় এই তো 'প্রথম বর্ষে' ভর্তি হলাম, তবে কী করে 'তৃতীয় বর্ষে' চলে এলাম, এই তো আমাদের নবীন বরণ হল কিন্তু ক্রমেই সব কোথায় চলে গেল। মন খুব খারাপ করে ছেড়ে চলে যেতে। তবু যেতে তো হবেই। দাঁড়াবার উপায় নেই। পিছন থেকে নবীনেরা ঠেলছে আমাদের খুব খারাপ লাগে, যখন মনে পড়ে শিক্ষকদের প্রতিটি ক্লাসের কথা, ক্লাসে কাটানো সেই এক-একটা সময়ের কথা। কষ্ট হয়। সময় তো থেমে নেই, সে ক্রমশ চলমান। মনে হয় জীবনে কত কিছু পাওয়া যাবে শুধু এই কলেজে কাটানো স্মৃতিময় মুহূর্তগুলো বাদে। দুঃখে জর্জরিত আমরা, যারা এই দিনগুলো ছেড়ে অনাগত অচেনা ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দিলাম।

নারীর অধিকার

মণীষা দাস
(বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দেবে অধিকার?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে যুগে দাঁড়িয়ে যে বিষয়টি বুঝেছিলেন আধুনিক যুগে এসেও আমরা সেটা বুঝি না। দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু আজও নারী পরাধীন, আজও নারী পুরুষের অধীনে। এখানে নারীর স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার নেই। পুরুষশাসিত সমাজ নিজের মতাদর্শকে জোর করে নারীর উপর চাপিয়ে দেয়। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যায় নারী নির্যাতন, পুত্র সন্তান জন্ম দিতে না পারায় মাকে মারধর। যদিও সন্তান পুত্র হবে কী কন্যা হবে তা পুরোপুরি নির্ভর করে পিতার উপর। বিয়ের পর বধূকে উচ্চ শিক্ষা লাভে বাধা দেয় তার শ্বশুর কুল। নারীর প্রত্যেক পদক্ষেপে আছে পরাধীনতার শৃঙ্খল। কুমারী অবস্থায় পিতার পরিচয়, বিবাহিত অবস্থায় স্বামীর পরিচয়, বৃদ্ধাবস্থায় সন্তানের পরিচয় নিয়ে নারী পরিচিত হয়। এর মধ্যে তার নিজের পরিচয়ই হারিয়ে যায়। অনেক পুরুষ চায় নারীর জীবনের দড়ি নিজের হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে। নারী অত্যাচারে শুধু যে পুরুষেরা দায়ী তা নয়, অনেক শ্বাশুড়ি যে নিজে নারী হওয়া সত্ত্বেও বধূর উপর অত্যাচার চালায়, নানান চাপ সৃষ্টি করে। আধুনিক যুগেও সন্তানদের মধ্যে পুত্র সন্তান যতটা সুবিধা পায়, কন্যা সন্তান তা পায় না।

এই সমস্ত কিছুর পিছনে আছে শিক্ষাহীনতা। মানুষ আজও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। দেশে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার আছে। কিন্তু এই আইনকে আমাদেরই কার্যকরী করে তুলতে হবে। তাই প্রয়োজন সুশিক্ষার, যা পাবে জ্ঞানহীনতাকে দূর করতে। নারীকে তার অধিকার দান করে বিশ্বকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে চলো। তাই খুলে দাও নিজের মনের দুয়ার। প্রবেশ করতে দাও জ্ঞানালোর কিরণ। তাকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে তোলো। পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েই শেষ করতে হয়—

"আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও...।"

Date - 15th Nov. - 17th November - 2016

2nd CYCLE NAAC ASSESSMENT
Date - 15th Nov. - 17th November - 2016
EXIT MEETING

NSS

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ